পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহে তাি

জীবনী-সংগ্রহ

দ্বিতীয় ভাগ।

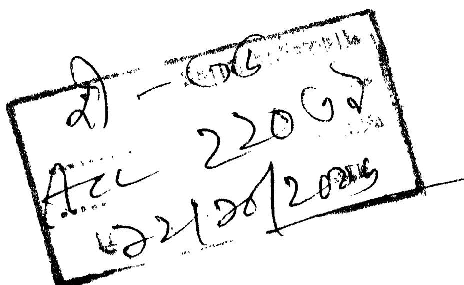
ধার্ম্মিকা, দানশীলা, বিদুষী ও পতিব্রতা
ভারত নারীর জীবনের চিত্র।

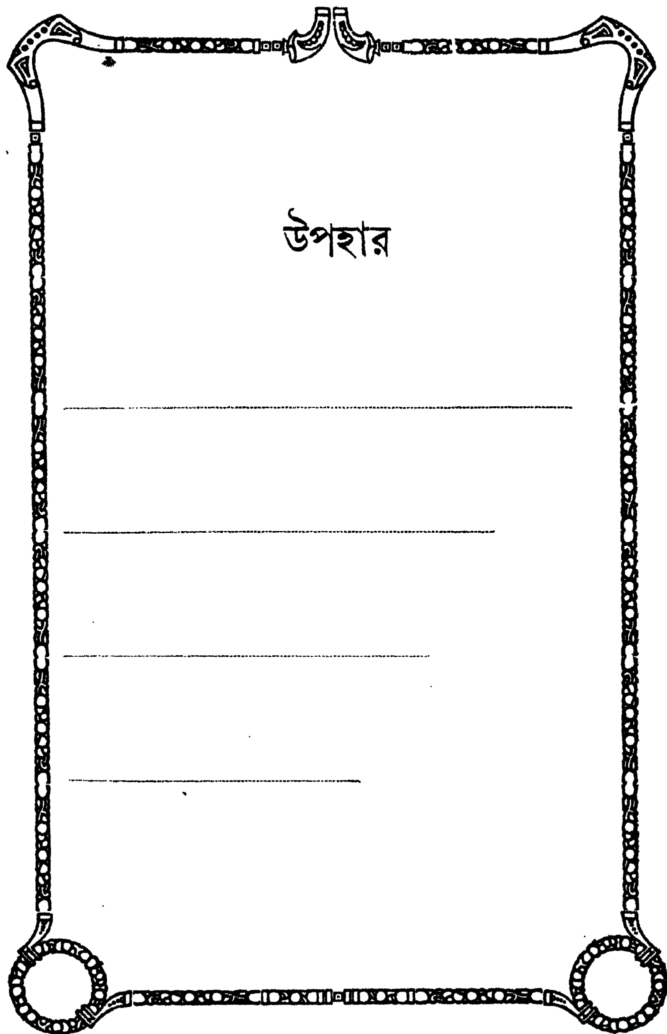
শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রিণ্টার—শ্রীমতিন্দ্র নাথ সিংহ
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।





উপহার

ভূমিকা

যাঁহার ইচ্ছায় আমি একদিন "জীবনী-সংগ্রহ" লিখিয়া প্রকাশ করি, তাঁহারই ইচ্ছায় ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। বিষয়বস্তু—সে-কালের কয়েকটী আদর্শ হিন্দুনারীর জীবনের কথা।

সুনিপুণ শিল্পী কৃত্তিবাস ও কাশীরাম যে অপূর্ব্ব দেবীচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দীনতম হিন্দুর নিভৃততম পর্ণকুটীরেও সুপরিচিত। কারণ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা—ইঁহারা কেবল শিল্পীর সৃষ্টি নন, বিশ্বস্রষ্টার মধুবৃষ্টি! সেই জন্য চিরপুরাতন ও চিরনূতন সে সকল চিত্রে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রশালা হইতে মাতৃচিত্র সংগ্রহ করিয়াছি।

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যখন কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া জড়ের মতো বসিয়া থাকে, দিশা কাটিতে চায় না, তখন মহতের সঙ্গ তাড়িত প্রবাহের কাজ করে। সে সঙ্গলাভের সৌভাগ্য না ঘটিলে তাঁহাদের জীবনের কথাও জড়িমা ঘুচাইয়া প্রাণের কাণে কাণে বলে—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত'। বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পথ দেখাইয়া দেয়। জীবন গড়িতে হইলেও যাঁহারা সকল দিক দিয়া সকলের বড়, দেশের দশজনে শ্রদ্ধাভরে যাঁহাদের মাথায় যশের মুকুট পরাইয়া দেন তাঁহারাই আদর্শ। সুতরাং তাঁহাদের জীবনী না-হইলে-নয় এমন বস্তু। সেই বিশ্বাসে এই নারীত্বের গীতায়ন রচিত।

আর এক কথা। বিজ্ঞেরা যুগযুগান্তের পরীক্ষাফলে জানিয়াছেন যে মহতের জীবনের রথ যে পথ দিয়া জয়যাত্রা করে সেই পথই পথ। সে পথে চলিলে না আছে কোন ভয়ের কারণ, না আছে বিপদের

সম্ভাবনা। তবে দুঃখ আছে; কিন্তু দুঃখের মূল্য দিয়াই তো আনন্দের অমূল্য সম্পদ কিনিতে হয়! ভারতের বর্ত্তমান নারী-সমাজে নবযুগের অরুণ-রশ্মি উদ্ভাসিত। এই শুভক্ষণে সেকালের পুণ্যবতী পুরনারীরা কি ভাবে ভারতের মহান আদর্শকে জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া মহিমার হিমাদ্রিশীর্ষে উপনীতা হইয়াছেন সে তথ্য ভরসা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই পুস্তক প্রণয়নে বহু পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেজন্য অপরিচিত বন্ধুদের নিকট আমি চির ঋণী।

বালি
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল।

শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১০	২	১৭৫৭	১৮৫৭



হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির।

জীবনী-সংগ্রহ

দ্বিতীয় ভাগ।

মীরাবাই

রাজপুত বীর, রাজপুত যোদ্ধা। অসি ও অশ্ব তাহার সখা। রণক্ষেত্র তাহার গৃহ। সেই রাজপুত বংশের কন্যা কিন্নরকণ্ঠী মীরাবাই। 'বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা'—প্রেম না দিলে প্রেমময় ধরা দেন না। গানের ভিতর দিয়া তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন। সে আজ কত দিনের কথা কিন্তু এখনও তাহার ঝঙ্কার ভক্তের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করে।

মীরার পিতা ছিলেন রাজপুতানার অন্তর্গত মেরোতা গ্রামের সামন্তরাজা। দেহে রূপের তরঙ্গ, কণ্ঠে 'সুরের সুরধুনী,' হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম, রাঠোরবালার ভজন যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত। যত শুনিত ততই শুনিবার আগ্রহ বাড়িত। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে থাকিত না। এমনই মধুর, এমনই আবেগ-ভরা সে সঙ্গীত।

শৈশব হইতেই মীরা জানিতেন—"মেরে গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোই।" সংসার বাসনা তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে সাহস পাইত না। প্রাণের দেবতা গিরিধর গোপালের নাম গান করিয়া তাঁহার দিন কাটিত আনন্দে।

বহু দূর হইতে লোক আসিত রাজবালার অপূর্ব্ব ভজন শুনিতে। ক্ষুদ্র মেরোতায় প্রত্যহ যেন আনন্দের হাট বসিত। সামন্তরাজ সমাগত ভজন-পিপাসীদের আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত করিতেন। সকলের মুখে মীরার ভজনের কথা। ক্রমে সে কথা পৌঁছায় যুবরাজ কুম্ভের কাণে। তিনি ছিলেন কবি—ছন্দ ও সুরের পশারী। মীরার কণ্ঠ-কাকলী শুনিতে তিনি একদিন ছদ্মবেশে মেরোতায় পদার্পণ করেন। তখন রূপসী গায়িকা গানে আত্মহারা। অসংখ্য শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া। সুর যেন মূর্ত্তি ধরিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ। গানের যেমন ভাষা, তেমনই ভাব, তেমনই গাহিবার ভঙ্গী। গান শুনিতে আসিয়া চিতোরের ভাবী-মহারাণা তাঁহার প্রাণটী তরুণী গায়িকাকে দান করিয়া শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে চিতোর হইতে ভাট আসে সামন্তরাজভবনে বিবাহ প্রস্তাব লইয়া। শৌর্য্যে বীর্য্যে, বংশগৌরবে, পদমর্য্যাদায়, সদ্‌গুণে কুম্ভের মত জামাতা পাওয়া তপস্যার ফল। মীরার পিতা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে মহামান্য মুকুলজীর পুত্র, মারবার-রাজের ভাগিনেয় তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী হইবেন।

"কন্যা কাময়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
জ্ঞাতয়ঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

বিবাহের কথা হইলে পাত্রী চায় পাত্রের রূপ, তাহার মা চান ধনসম্পত্তি, পিতা; বিদ্যা ও যশ, আত্মীয়েরা সদ্বংশ এবং বাকীসকলে দক্ষিণহস্তের প্রচুর ব্যবস্থা।

কুম্ভের প্রস্তাব সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন এবং শুভদিনে শুভ লগ্নে মীরা-কুম্ভের শুভমিলন ঘটে। মেরোতায় গানের পালা শেষ করিয়া মুক্তবিহঙ্গিনী রাজপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া চিতোর যাত্রা করেন।

নবজীবনের আনন্দে কিছুদিন বেশ যায়। সময়ে সময়ে মীরার কিছুই ভাল লাগে না। উন্মনা হইয়া কি যেন ভাবেন। প্রিয়ার ভাবান্তর রাণা কুম্ভকে ভাবাইয়া তোলে। উভয়ের প্রাণের সুর যেন মিলিয়াও মিলিতে চায় না। কোন কিছুর অভাব নাই তথাপি মনে হয় কি যেন একটা নাই। দুইজন যেন দুই তীরে; সেতু বাঁধিলে মিলন ঘটে কিন্তু বাঁধিবার লোকাভাব।

মীরাকে ভুলাইবার জন্য কুম্ভ তাঁহাকে কবিতা রচনা শেখান। কবিতার ছন্দ সুরের যাদুমন্ত্রে সজীব হয়। সেই সুরের অভাব বোধ করিতেন চিতোরেশ্বরী। মনে পড়িত কুমারী জীবনের গানের ভিতর দিয়া প্রীতম্‌কে দেখার আনন্দ। মহারাণার অন্তঃপুরে থাকিতে হয় নিয়মের বেড়াজালে। একটু এদিক ওদিক হইলেই নিন্দা। ভজনের একটীমাত্র শ্রোতা—স্বামী। কণ্ঠ খুলিয়া গাহিবার যো নাই। আর একটী অশান্তির কারণ—ধর্ম্মমত। মীরা হরিভক্ত। শ্বশুরবংশ শৈব। ভগবান্ একলিঙ্গের উপাসক। জ্ঞানীর চক্ষে যিনি হর তিনি হরি। ভক্তের চক্ষে প্রভেদ ঠেকে। উপাস্যের রূপই তাহার ধ্যেয়। অন্যরূপ ভাল লাগে না। হনুমানের মত মহাভক্তও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"শ্রীনাথো জানকীনাথো অভেদ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম রাজীবলোচনঃ।"

'লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি উভয়ে অভিন্ন, কিন্তু নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রামচন্দ্রই আমার আরাধনার ধন—আমার সর্ব্বস্ব।'

ভগবান্ একলিঙ্গের পূজা না করিয়া মীরা যে হরি পূজা করেন ইহা রাজমাতা দেখিতে পারিতেন না। পুত্রবধূকে কত কথা বলিতেন। মীরা গিরিধরকে মনে মনে বলিতেন—"গোপীবল্লভ, আমাকে মুক্তি দাও। তোমার নাম গাহিয়া পথে পথে বেড়াইতে হয় সেও ভাল তবু এ রাজৈশ্বর্য্য কিছু নয়।"

রাণা কুম্ভ দেখিতেন মেরোতায় যাহার রূপ দেখিয়া ও কণ্ঠ কাকলী শুনিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন সে মীরা এ মীরা নয়। তাহার প্রাণ ছিল ইহার প্রাণ নাই। সংসার ধর্ম্ম না করিলে নয় তাই করে। এ যেন যন্ত্রচালিত ছবি।

প্রিয়তমাকে সুখী করিবার জন্য রাণা রাজপুরীতে গোবিন্দজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শৈব রাণাবংশে আর কেহ এমন করেন নাই। লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। মীরার অনুরোধে রাণা আদেশ দিলেন যে, মন্দির-প্রবেশে বৈষ্ণবমাত্রেরই অধিকার আছে। কেহ যেন কোন বৈষ্ণবকে বাধা না দেয়, তাহাকে উত্যক্ত না করে। মীরার মলিন মুখে শরতের জ্যোৎস্না দিল দেখা। মেঘ জমিল রাণাকুম্ভের অন্তরে। মীরা মন্দির ছাড়িয়া এক দণ্ড কোথাও যান না। অহোরাত্র গোবিন্দের সেবা ও ভজন লইয়া থাকেন। বৈষ্ণববেশী যে কেহ আসে তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন। যেন ভাইভগিনী। রাণা বিজনকক্ষে রাত্রি কাটান। যাহাকে চান সে প্রিয়া আর তাঁহার সেবা করিবার সময় পায় না। সে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, হরিই তাহার ধ্যান, জ্ঞান। রাণা শুনিতে পান মীরা গাহিতেছে—

"বসো মেরে নয়নন্ মে নন্দদুলাল।
সাঁবলি সুরত মোহন মূরত
নয় না বনে রসাল।

মৌর মুকুট মকরাকৃতি কুণ্ডল
অরুণ তিলক শোভে ভাল।
অধর সুধা রস মুরলী বাজতি
ঔর বৈঁজতী মাল॥
ক্ষুদ্রঘন্টিকা কটিতট শোভিত
নূপুর শব্দ রসাল।
মীরা প্রভু সন্তন সুখদায়ী
ভকত বছল গোপাল।”

রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সুর আসে দূরের কথা বলিতে। কখন শোনেন মীরা বলিতেছে—

"শুনি ম্যয় হরি আওয়নকি আওয়াজ।
মহল চড়ি চড়ি যাঁউ মোরি সজনি
কব্ আওয়ে মহারাজ।
দাদুর মৌর পপিহা বোলৈ
কোয়েল মধুরৈ সাজ।
বরসে বাদরবা মেঘা বোলৈ
দামিন্ ছোড়ি লাজ॥
ধরতি রূপ নয়া নয়া ধরিয়া
পিয়া মিলন কি কাজ।
মীরা কি চিত ধীরা ন মানৈ
বেগ মিলো মহারাজ।”

কুম্ভের প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। মীরা তাঁহার জন্য ব্যাকুল নয়। তাহার চিত্ত উন্মুখ রাখালরাজার জন্য। মহারাণার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কোন দিন গভীর রাত্রে তিনি গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়া

দেখিতেন মীরা ধ্যানমগ্না। তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। স্বেদ, কম্প ও পুলকে লাবণ্যময়ীর তনু রোমাঞ্চিত। বিমর্ষচিত্তে রাণা আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিতেন।

স্বামীর বিষণ্ণ মুখ মীরাকে দুঃখ দিত। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন 'রাণা, সংসারের আনন্দের শেষ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত পানে যে আনন্দ তার শেষ নাই। আসুন, আমরা একত্রে তাঁর ভজনা করি। আপনি করুন তাঁর ভজন-রচনা, আমি করি গান। আপনি ধন্য হোন্, আমাকেও ধন্যা করুন।' কুম্ভ বলিলেন, 'মীরা, স্বদেশের সেবা, প্রজাপালন রাজধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম যদি না পালন করি ধর্ম্মরাজ হবেন রুষ্ট। তবে সময়ে সময়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারি যদি তুমি আমার কাজে যোগ দাও।' যে প্রাণ ব্রজকিশোরকে দিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আর কি মীরা সংসারে দিতে পারেন! তিনি নতমুখে বলিলেন "তা যে আর হয় না, রাণা। আমি তো আপনার দাসী আছিই। আপনার সেবার জন্য আপনি আর একটী দাসী আনুন। আমি তার হাতে আপনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তমনে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি।"

কুম্ভের মনে পুনরায় বিবাহের কথা যে না উঠিত তাহা নয়। তাঁহার জননীরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে পুত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। রাণা সংশয়ে দুলিতেন। কখন ভাবিতেন—নাঃ, আলেয়ার পিছনে আর ছুটিতে পারি না। ঝালোয়ার রাজকুমারী রূপে তিলোত্তমা। তাহার পাণিগ্রহণ করিলে বোধ হয় জ্বালা জুড়াইবে। কখন ভাবিতেন - মীরার ধ্যানেই জীবন কাটাইব। তাহাকে সুখী করিয়া আপনি সুখী হইব।

রাজমহিষীর বৈষ্ণবের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, অহোরাত্র মন্দিরে বাস, সকলের সম্মুখে নামকীর্ত্তন অধিকাংশ প্রজার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিতে

লাগিল। ক্রমে কুৎসা আত্মপ্রকাশ করিল। লোকনিন্দার জন্য নিরাপরাধা জানকী নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন। মীরাকেও সেই দণ্ডভোগ করিতে হইল। রাণা কুম্ভ তাঁহাকে চিতোর ত্যাগের আদেশ দিলেন। মীরা ভাবিলেন—ভালই হইল। এইবার তিনি ইচ্ছামত গোপালের ভজনা করিতে পারিবেন। লজ্জা, মান, ভয় আর তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না।

"মেরে গিরিধর গোপাল দুস্‌রো ন কোই।
যাকে শির মৌর মুকুট মেরো পতি সোহি
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কণ্ঠমাল হোই॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো নো কোই
অব্‌তো বাত ফৈল গই জানৈ সব কোই॥
সন্তব সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ থোই।
ছোড় দই কুল কি লাজ ক্যা করেগা কোই॥
অঁসুঅন জল সিঁচ সিঁচ প্রেমবীজ বোই।
মীরা প্রভু লগন লাগি যে হোয় সো হোই।"

গাহিতে গাহিতে চিতোরের রাজমহিষী চলিলেন দেশান্তরে। সে গান যে শোনে সেই তাঁহার সাথী হয়। রাণা কুম্ভ ভাবিয়াছিলেন মীরাকে ত্যাগ করিলে তিনি অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দেখিলেন সহস্র বাহু মেলিয়া অশান্তি তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত। তিনি মীরার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। অবিলম্বে সন্ধান মিলিল। রাণা মীরাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি চিতোরে ফিরিয়া আসেন। বুঝিতে না পারিয়া তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা যেন সতী ক্ষমা করেন। স্বামীর আদেশে নির্ব্বাসিতা মহিষী চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। গোবিন্দজীউর মন্দিরে সঙ্গীতের রসধারা

বহিতে লাগিল। সাধু, বৈষ্ণব, দরিদ্র আশ্রয় পাইল। নিরানন্দ রাজপুরী আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

যে বাঁশী শুনিয়া যমুনা উজান বহিত, ব্রজনারী কুলত্যাগ করিত তাহার ডাক মীরা নিত্য শোনেন। প্রাণ উতলা হয়। বাঁশীর ঠাকুর উপায় করিয়া দিলেন। রাণা কুম্ভ মীরাকে পুনরায় চিতোর ত্যাগের আদেশ দিলেন। ভিখারিণীর সাজে হৃষ্টমনে চিতোরেশ্বরী চলিলেন ব্রজবল্লভের নিত্যলীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবনে। পথ জানেন না। তিনি একা। কিন্তু নির্ভয়।

"তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহে কেঁও তরসায়ো।
অব ছোড়্যা নহি বনে প্রভুজী
চরণকো পাশ বুলায়ো।
বিরহ বিথা লাগি উর অন্দর
সো তুম আয়ো বুঝায়ো।
মীরা দাসী জনম জনমকী
চিত্তসু চিত্ত লগায়ো।
(মম) অঙ্গসু অঙ্গ লগায়ো।"

হাল ছাড়িয়া দিলেই কাণ্ডারী হাল ধরেন। তাঁহার উপর নির্ভর করিলে জীব নির্ভয় হয়। অন্ধ বিল্বমঙ্গলকে ভক্তের ভগবান রাখালের বেশে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। অজানা পথের পথিক মীরা জীবনেশ্বরকেই ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন অজানাকে জানিতে। অপূর্ব্ব কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত সুধা ঢালিতে ঢালিতে চলিল। রাণী বাহির হইয়াছিলেন একা। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন বহু সঙ্গী লইয়া। লোকে শুনিয়াছিল চিতোরের রাণী বৃন্দাবনবাসিনী হইবেন। তাঁহাকে দেখিয়া

তাহারা চক্ষুসার্থক করিল। তাঁহার অপূর্ব্ব ভজন শুনিয়া তাহারা জীবনে যে আনন্দ কোন দিন পায় নাই সেই আনন্দ পাইল। বৃন্দাবনে যেন নবতর সুরে শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মীরার কথায়, আচার ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইল। শ্যামের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগিনী মীরাকে দেখিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

পরম বৈষ্ণব ভক্তচুড়ামণি রূপ-গোস্বামী বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া মীরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রভুপাদ রূপ সন্ন্যাসী। তিনি স্ত্রীলোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। সে কথা শুনিয়া মীরা তাঁহাকে পত্রযোগে জানাইলেন যে বৃন্দাবনে পুরুষ বলিতে আছেন একজন—গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভিন্ন সকলেই গোপী। গোস্বামী ঠাকুর যদি আপনাকে পুরুষ মনে করেন তবে তিনি যেন বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্রে যান। মুরলীমনোহরের লীলাক্ষেত্রে বাস করিয়া যে তাঁহার অহমিকা দূর হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য।

পত্র পড়িয়া রূপগোস্বামীর চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন এতদিন সাধনার নামে তিনি অহঙ্কারের পূজা করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাত্রী মীরাকে পরম সমাদরে আপনার আশ্রমে লইয়া আসিলেন। কৃষ্ণকথায় উভয়ে পরম প্রীতি পাইলেন।

মীরার অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। পুণ্যলোভীর দল তাঁহার কুঞ্জদ্বারে ভিড় করিতে লাগিল। তাঁহার সুমধুর ভজন শুনিয়া তাহারা আত্মহারা। কুঞ্জ ছাড়িতে চায় না। রসগ্রাহী তাহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব জানিয়া লইল। তাঁহার ভাবময় পদাবলি কণ্ঠে কণ্ঠে সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠের বাণী প্রচার করিতে লাগিল।

বৃন্দাবনে বহুদিন বাস করিয়া মীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাভূমি দেখিতে মথুরা হইয়া দ্বারকায় যান। যিনি রাজরাণী হইয়া জীবনসর্ব্বস্ব

ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শুনিতে তীর্থে তীর্থে সে কি আগ্রহ, কি উদ্দীপনা! সকলের বিশ্বাস ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে মীরা হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। দ্বারকাতেই প্রেমময়ী মীরার লীলাবসান হয়। ভক্তমণ্ডলী বলেন দ্বারকানাথের শ্রী-অঙ্গে তিনি অন্তর্হিতা হন; তাঁহার মিনতি—"**অঙ্গসু অঙ্গ** লগায়ো" সার্থক হয়।

মীরার ত্যাগ, কৃষ্ণপ্রেম, সাধনা ও সিদ্ধি সমস্তই অতুলনীয়। তেমনই অতুলনীয় তাঁহার প্রেমের অভিব্যক্তি—চিরমধুর ভজনগুলি। জগৎস্বামীর জন্য তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন হাসিমুখে। লোকনিন্দা তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কটাক্ষ করিয়াছে। স্বামী বাধ্য হইয়া দণ্ড দিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বলিয়া সে দণ্ড মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কখন রাণা কুম্ভকে দোষ দেন নাই। বলিতেন—"রাণা আমাকে কষ্ট দিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ লাভের উপায় বলিয়া দিয়াছেন। দাসীর উপর তাঁহার অসীম কৃপা।" মীরার বহু ভজন সুকবি রাণা কুম্ভের রচনা। কবিতার মধ্যেই উভয়ের মিলন ঘনীভূত।

মীরার তিরোভাবের পর তাঁহার মত ও পথ লোকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। এখনও মিবারে রণছোড়জীর পূজার সঙ্গে মীরার মূর্ত্তির পূজা হয়। তাঁহার পদাবলির বহু গায়ক গায়িকা।



চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

(মায়াপুরের প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি হইতে গৃহীত)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

স্বামী—হিন্দুনারীর চিরউপাস্য দেবতা। তাহার চিরবাঞ্ছিত। সে স্বামীর জন্য অসাধ্যসাধন করে। তপস্যায় সে উমা, মৃত্যুবিজয়ে সাবিত্রী, সেবায় দ্রৌপদী, জন্মান্ধ স্বামীর অনুবর্ত্তনে গান্ধারী। মিলনে-বিরহে-বিচ্ছেদে স্বামীই তাহার ধ্যান জ্ঞান। পরজন্মে তাঁহাকেই পাইবার প্রার্থনা করে সে। লোকনিন্দায় নির্ব্বাসিতা সীতা, দেবরোষে দময়ন্তী, ঋষিচক্রে শৈব্যা, গ্রহকোপে চিন্তা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতের শীর্ষস্থানীয়া। ত্যাগে, সহিষ্ণুতায়, পাতিব্রত্যে ইঁহারা চিরপূজ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গবল্লভা বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহের বীণাপাণি। চির-বিচ্ছেদের রামগিরিতে নির্জ্জনবাস করিয়া পতিব্রতা যে ভাবে স্বামীর ধ্যানে জীবন কাটাইয়াছেন ভাষা তাহাকে বাঁধিতে পারে না। সে এক বিচিত্র মেঘদূত।

নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকে মালঞ্চপাড়া। এই গ্রামে অনুমান ১৪১৬ শকাব্দায় বাসন্তী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম। তাঁহার পিতা সনাতন মিশ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁনের সভাপণ্ডিত। সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীঠাকুরাণীও ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্না।

"বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ যিনি লাখ বাণ সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা।"

সনাতন এবং তাঁহার পত্নী মহামায়ার প্রথম সন্তান বিষ্ণুপ্রিয়া। অলোকসম্ভবা রূপলাবণ্য। মিশ্রদম্পতীর আনন্দ সাগরে যেন বাণ

ডাকিয়া গেল। দেবদেবী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, দীনদুঃখী সকলকেই যথাযোগ্য প্রাপ্য দিলেন সনাতন।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া জননীর নিকট বিপ্রকন্যার করণীয় বারব্রত পূজাদি শিখিতে লাগিলেন।

"শিশু হইতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান,
পিতৃমাতৃ বিষ্ণুভক্তি বই নাহি আন।"

গঙ্গার ঘাটে শচীদেবীর সঙ্গে মহামায়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রায়ই দেখা হইত। মাতৃনিদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া গুরুস্থানীয়া নিমাইয়ের জননীকে প্রণাম করিতেন। ৮।৯ বৎসরের সুন্দরী বালিকাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিতেন শচীদেবী। বলিতেন—"মা, কৃষ্ণ তোমায় যেন একটী ভাল বর জুটিয়ে দেন।" লাবণ্যবতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় আরও সুন্দর দেখাইত।

শচীদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি অঞ্চলের নিধি নিমাইয়ের বড় সাধ করিয়া অল্প বয়সে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সাধ মিটিতে পায় নাই। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইত যে পুত্রবধূ করেন। বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিতেন না অবস্থার জন্য। সনাতন ধনবান; তিনি দরিদ্রা। সত্য বটে তাঁহার নিমাই রূপে সুন্দর, রুচিতে সুন্দর, পাণ্ডিত্যে সুন্দর, চরিত্রে সুন্দর কিন্তু বিবাহের শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র যে ধনসম্পত্তি তাহা তো তাঁহার নাই। সনাতন যদি তাঁহার প্রস্তাব না শোনেন। কন্যাপক্ষ কিন্তু নিমাইকে জামাতা করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলনের অগ্রদূত কাশীনাথ ঘটক সনাতনের নিকট বিবাহের কথা

তুলিতেই তিনি আনন্দিত মনে সম্মতি দিলেন। কথাবার্ত্তা ও বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। বৈশাখী পূর্ণিমাতে মহাসমারোহে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১; বিষ্ণুপ্রিয়ার ১১।১২। বুদ্ধিমন্ত খাঁন পাত্রপক্ষের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। ধনবান রাজপণ্ডিত জামাতাকে যৌতুক দিলেন—দিব্যধেনু, ভূমি, শয্যাদ্রব্য, দাসদাসী। বিষ্ণুপ্রিয়া বহুদিন পূর্ব্বে মনে মনে গৌরবরণ গৌরাঙ্গের গলায় মাল্যদান করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার অন্তর বাহির রঙে রঙে এক হইয়া গেল। পুরবালার ঘন ঘন মঙ্গলধ্বনিতে উৎসব রজনী মুখরা। ভবনে আনন্দ, ভুবনে আনন্দ, গগনে আনন্দ, পবনে আনন্দ—সর্ব্বত্র আনন্দের মেলা। কিন্তু যে অমঙ্গলগ্রহ চিরবিচ্ছেদের রূপ ধরিয়া অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিবে সে এই মঙ্গলোৎসবে একটা ইঙ্গিত করিয়া চকিতে সরিয়া গেল। বাসরঘরের পথে বিষ্ণুপ্রিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে দারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। দেখিতে পাইয়া নিমাই আপনার পদাঙ্গুলি দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত বন্ধ হইল। প্রিয়তমের প্রাথমিক পরিচর্য্যার আবেশে বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনা আনন্দে পরিণত হইল। এক নিমেষের ঘটনা। পুরবালারা কেহই দেখিতে পাইলেন না। কৌতুকে আমোদে সে রজনী কাটিল।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় বরবধূ নদীয়ার পথ আলো করিয়া গৃহে আসিলেন। নয়ন ভরিয়া যুগলরূপ দেখিয়া নদীয়াবাসী পরিতৃপ্ত হইল। কেহ বলিল—হরগৌরী দেখিলাম। কেহ বলিল—লক্ষ্মীনারায়ণ। কেহ বলিল—মদন-রতি। যাহার মনে যে ভাব উদয় হইল সে তাহাই বলিতে লাগিল। সীমাহীন আনন্দে শচীমাতা রূপের ডালি বধূমাতাকে বরণ করিয়া গৃহলক্ষ্মীর আসন পাতিয়া দিলেন।

বিবাহের পর নিমাই চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রবিচারে অপরাজেয়, সারল্য ও সৌজন্যে চিরসুন্দর, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় অনন্যসাধারণ "নিমাই পণ্ডিত" অল্প দিনে বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। সকলে শচীদেবীর নাম দিল রত্নগর্ভা।

হিন্দুনারী যে কামনায় শিবপূজা ও বারব্রতাদি করে বিষ্ণুপ্রিয়ার সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে। শাশুড়ীর অন্তহীন স্নেহ; কন্দর্প প্রতিম দেবতুল্য স্বামীর ভালবাসা তাঁহার চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডী ছাড়াইয়া জীবনে মধুযামিনী আনিয়া দিয়াছে। অনাবিল আনন্দ—তাহার না আছে তল না আছে কুল। সকলে নিমাইচাঁদের সুখ্যাতি করে, তাঁহার কাণ জুড়াইয়া যায়। স্বামী সৌভাগ্যে আপনাকে ধন্য মনে করেন। কেবল কখন কখন একটা অজানা উদ্বেগ তাঁহাকে উন্মনা করে। তাহার না পাওয়া যায় হেতু, না বোঝা যায় অর্থ।

সংসারের সমস্ত কাজ বিষ্ণুপ্রিয়াই করেন। প্রত্যেকটীতে তাঁহার গভীর ভালবাসার রেখা ফুটিয়া উঠে। শচীমাতা কোন কাজ করিতে গেলে তিনি করিতে দেন না, বলেন—"কেন, মা, আমি তো রয়েছি। ও আপনি রেখে দিন। আমি কর্ব্ব।" শচীদেবী তাঁহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলেন—"সবই তো তুমিই করচ, মা। আমাকে আর করতে দাও কি।" কেবল আপনার হবিষ্যান্ন তিনি আপনি রাঁধিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া যোগাড় করিয়া দিতেন। রাঁধিতে চাহিলে শচীদেবী বলিতেন—"কি জানি মা, তুমি কি জাতের মেয়ে। শেষে তোমার হাতে খেয়ে কি জাত যাবে।" বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিতেন - "আচ্ছা, আগে মন্ত্র নিই, তারপর জাত আপনার থাকে কি না দেখে নেব। তা, মা, মন্ত্রটা শীগগির দিইয়ে দিন না, তাহলে আপনাকে তো কষ্ট করে রাঁধতে হয় না।" "শচীদেবী বলিতেন—"মন্ত্রের এত

তাড়াতাড়ি কি, মা। সে কৃষ্ণের ইচ্ছা হলেই হবে।" বিষ্ণুপ্রিয়ার রান্নাবান্না লইয়া নিমাই শচীদেবীর সহিত যে মধুর হাস্য পরিহাস করিতেন তাহা অন্তরালবাসিনী বধূর কাণে মধু ঢালিয়া দিত।

যে মধুর ভাবের বন্যায় নদীয়া-শান্তিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দেশ ভাসিয়া যাইবে তখনও তাহার সময় আসে নাই। নিমাই নিদ্রিত নারায়ণ। ধর্ম্মে গ্লানি, কর্ম্মে গ্লানি, মানুষের মর্ম্মে গ্লানি। ব্যথাতুরা বসুমতীর দিবানিশি প্রার্থনা—"জাগো, নারায়ণ, জাগো।" দৈববাণী তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া যায়—'দিন আগত ঐ।'

অচিরে শুভদিনের আগমনী গাহিতে রাত্রিশেষের শুকতারা দিল দেখা। নিমাই পিতৃকার্য্য করিতে গয়াধাম যাত্রা করিলেন। বিষ্ণুপদ মন্দিরে ঘটিল তাঁহার ভাবান্তর। গুরু ঈশ্বরপুরী দিলেন দেখা এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা। পণ্ডিত নিমাই ভক্তিসাগরে তলাইয়া গেলেন। ভাসিয়া উঠিলেন ভক্ত নিমাই—প্রেমিক নিমাই। নদীয়ায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি হরিনাম জপ, হরিধ্যান, ও নামকীর্ত্তনে মাতিলেন। হরিসাধনা ভিন্ন আর কোন কিছুতে তাঁহার মন বসে না। অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিলেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আর প্রাণ ভরিয়া স্বামী-সেবা করিতে পান না। নিমাই অহর্নিশি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত। এক একদিন রাত্রে সঙ্কীর্ত্তনের পর তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিষ্ণুপ্রিয়ার কক্ষে আসিতেন। তাঁহার সেই অপ্রকৃতস্থ ভাব দেখিয়া ভীতা তরুণী শচীমাতাকে ডাকিয়া আনিতেন। তখন নিমাই ভাবরাজ্য হইতে প্রতিদিনের জগতে নামিয়া আসিতেন। কৃষ্ণকথায় রাত্রি প্রভাত হইত। যৌবন-কুঞ্জে বিষ্ণুপ্রিয়ার "শেফালী-বনের মনের কামনা" গুমরিয়া মরিত। স্বামীর ব্রতই স্ত্রীর ব্রত।

বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা জানিতেন। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে দেবদুর্ল্লভ স্বামীর নব সাধনার সাফল্য কামনা করিতেন। ধ্যানমগ্ন নিমাইয়ের দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষে পলক পড়িত না। অঙ্গনে পরিষৎ-সঙ্গে স্বামীর নৃত্যলীলা তিনি অন্তরাল হইতে দেখিতে দেখিতে বিশ্বভুবন বিস্মৃত হইতেন। কিন্তু স্বামী-সেবার নিজস্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহার অবাধ্য হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। কত রাত্রে তিনি দয়িতের পদসেবায় বিভোর, এমন সময়ে কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া উপাস্যের পদসেবা করিতে বসিত। অবগুণ্ঠনবতী বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে কক্ষান্তরে চলিয়া যাইতেন। পড়িয়া থাকিত তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাস বেদনার সাক্ষ্য দিতে। শচীমাতা বধূর মৌন ব্যথা বুঝিতেন কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন। সময়ে সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা হইত নিমাইকে বলিবেন—“ভক্তেরা তো তোমাকে সর্ব্বক্ষণ পান। আমি যে দুদণ্ড সেবার অবকাশ পাই না। এ দুঃখ রাখি কোথা।” আবার ভাবিতেন—“ছি ছি ও কথা কি বলে। উনি যে এখন সকলেরই আরাধ্য দেবতা। আমার তো আছেনই জীবনে মরণে। এই কি কম সৌভাগ্য।” কত রাত্রে নিমাই সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষে ঘুম আসিত না। ব্যর্থ নিশা ব্যথায় কাটিত।

যুগান্তরের বাঁশী মধুর সুরে ডাকে ‘ওরে তোরা আয়, আয়। কাহারও ঘুম ভাঙ্গে কাহারও ভাঙ্গে না। নিমাই দেখিলেন গৃহত্যাগ না করিলে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলানো অসম্ভব। নাম না বিলাইলে জীবোদ্ধার ব্রত অপূর্ণ থাকিবে। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণই স্থির করিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস। দিন কয়েকের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন। কিন্তু এবার সেখানে কিছুই ভাল লাগে না। অকারণে আয়ত চক্ষু দুইটী ছলছল করে। মনে হয় কি যেন একটা অমঙ্গল

তাঁহার জীবনের সুখশান্তি গ্রাস করিতে আসিতেছে। এমন সময়ে তিনি লোকমুখে শুনিলেন—নিমাই সন্ন্যাসী হইবেন। সেই দণ্ডে তিনি পতিমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অশ্রুভরা মিনতি এবং শচীমাতার অনুরোধ নিমাইয়ের পথরোধ করিল। তিনি আপাততঃ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থগিত রাখিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইল। তিনি প্রাণ ভরিয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন।

চিরবিচ্ছেদের পূর্ব্বরাত্রে নিমাই মিলনের পাত্র পূর্ণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে অমৃত পান করাইলেন। অপরিসীম আনন্দে বিষ্ণুপ্রিয়া আত্মহারা। তাঁহার যৌবনকুঞ্জ গন্ধে গানে আলোকে পরিপূর্ণ। নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গেল। রাত্রি শেষ হয় হয়। নিমাই অতি সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া গৃহের বাহির হইলেন। উদ্দেশে জননীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মা, আমার অভাবে তোমাদের কষ্ট হইবে জানিয়াও আমি পথের সন্ধানে চলিলাম। ক্ষমা করিয়ো। তোমাদের ক্ষতিতে যেন জগতের লাভ হয়।" ভোরের শুকতারা আর্দ্রনয়নে চাহিয়া রহিল। তরুলতার মর্ম্মরে যেন কাহার মর্ম্মভেদী বিলাপ আছাড়িবিছাড়ি খাইতে লাগিল; নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার উন্মুক্ত কক্ষে সমীর অকরুণ প্রিয়তমের বিরহে আকুল হইয়া উঠিল। সহসা বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন শয্যায় স্বামী নাই। তবে কি—ত্রস্তপদে দুয়ারে গিয়া দেখিলেন, উন্মুক্ত। বুঝিলেন মন্দির শূন্য করিয়া সুন্দর চলিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতার দুয়ারে গিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—"মা, ও মা, শীগ্‌গির উঠুন।" নিমাই সন্ন্যাসী হইবে শুনিয়া অবধি দুর্ভাবনায় জননী রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। বধূ ডাকিতেই—"কেন, মা, কি হয়েছে" বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে আসিলেন। প্রদীপের আলোকে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার

প্রাণ উড়িয়া গেল। তবে নিমাই সত্যই তাঁহাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"নিমাই, এই তোর মনে ছিল, বাবা। বুড়ো মাকে ফেলে, এমন সোণার প্রতিমা বৌকে পায়ে ঠেলে তুই চলে গেলি। ওরে আমাদের যে আর কেউ নেই। বড় দুঃখী আমরা। ফিরে আয়, বাবা, ফিরে আয়।" কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মনে হইল—নিমাইয়ের কোমল প্রাণ, সে কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে। হয়তো নিকটেই কোথাও গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। বৃথা আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন—"পিদিমটা ধরবে চল তো মা। একবার ভাল করে খুঁজে দেখি।" দুইজনে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। সদরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া শচীমাতা কত ডাকিলেন—'নিমাই, ওরে নিমাই।' অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর শূন্যে মিলাইয়া গেল। জনহীন পথ বলিল—নাই, নাই, সে এখানে নাই। নিদারুণ শোকে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা ঠিক সন্ধ্যার মুদিত কমলের মত। তাঁহার বেদনা অব্যক্ত এবং সীমাহীন। স্বামী তাঁহাকে বিনা-দোষে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু যে কর্ত্তব্য স্বামী অকর্ত্তব্য ভাবিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাহা যে পতিঋণ—সহধর্ম্মিণীকে তাহা পরিশোধ করিতেই হইবে। শচীমাতা যাহাতে সান্ত্বনা পান বিষ্ণুপ্রিয়া আপনার দুঃখের দুয়ার বন্ধ করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। নদীয়ায় নিশান্ত হইল, হইল না নিমাইহীন শচীমাতার কুটীরে। তাঁহাদের দুঃখে নদীয়াবাসী সকলেই 'হায়, হায়' করিতে লাগিল। গদাধর, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা প্রভুকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি তখন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে।

"যেদিন নবীন সন্ন্যাসীবেশে মুণ্ডিত শিরে দণ্ড ধরে',—
সোণার অচল সজলচক্ষে জীবের দুয়ারে ভিক্ষা করে,
ছাড়ি নদীয়ার মহাবৈভব বৃদ্ধা জননী তরুণী প্রিয়া,—
সোণার গৌর ভিক্ষু সাজিল, দ্রবিল সেদিন জীবের হিয়া।
ভক্ত হৃদয়-বিদারি সেদিন উঠিল দারুণ কি হাহাকার!
পতিতের লাগি' নিমাই বিরাগী, ধন্য কলির যুগাবতার।"

তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া ভোগবদ্ধ জীব মুগ্ধ হইল। তাঁহার চরণে আশ্রয় লইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিল। নবীন সন্ন্যাসী বৃন্দাবনের নিত্যলীলায় যোগ দিতে ব্যাকুল। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা ধরিলেন—নদীয়ায় না যান, একবার শান্তিপুরে চলুন। আত্মীয়স্বজন আপনাকে দেখিয়া ধন্য হোক। নিমাই নাম পাইয়াছেন শ্রীচৈতন্য। লোকের চৈতন্য দিতেই তাঁহার আবির্ভাব। বলিলেন—"তাহাই হোক। নিতাই, তুমি ভাই যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিয়ো।" নিত্যানন্দ বলিলেন "সকলেই যদি আসিতে চান?" প্রেমের ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন নিত্যানন্দের প্রশ্নের উদ্দেশ্য। উত্তর দিলেন—"আপত্তি নাই। কিন্তু একজনকে আনিয়ো না।" একজন—তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি যে এখন সন্ন্যাসী। স্ত্রীকে দেখিতে নাই। মর্ম্মাহত নিত্যানন্দ নদীয়ায় একজন ছাড়া সকলকে আনিতে চলিয়া গেলেন। সকলেই দর্শন-প্রয়াসী। শচীমাতার অঙ্গনে নদীয়ার নরনারী সমাগত। শচীমাতা দোলায় উঠিতে যাইবেন—অঞ্চলে টান পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। নিরুপায় নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু বলিয়াছেন সকলেই যাইবে কিন্তু একজন নয়।" সেই একজন যে কোন অভাগিনী বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। সমাগত সকলেই ব্যথা পাইলেন। যিনি অঞ্চল ধরিয়াছিলেন তিনি

অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া নীরবে অন্তরালে চলিয়া গেলেন। শচীমাতা উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া বলিলেন—"নিতাই, তুমি আমাকে রেখে এঁদের সকলকে নিয়ে শান্তিপুর যাও।" লোক দিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন—"মা, আপনি না গেলে কি চলে? উনি যে এখন সন্ন্যাসী। আমাকে দেখতে নেই। তাই আমাকে যেতে মানা করেছেন। আপনি যান—না গেলে মলেও আমার দুঃখ যাবে না।" অগত্যা সকলের সঙ্গে শচীমাতা শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। হরিধ্বনিতে নদীয়া পরিপূর্ণ হইল। সকলে চলিয়া গেলে বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রু আর যুক্তির বাধা মানিল না।

"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।"

মন্দির শূন্য। নদীয়া শূন্য। দশদিক শূন্য। তাঁহার ভুবন অন্ধকার। আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন—রবিশশীর উদয়াস্ত বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার—"মলিন চিকুর তনুচীরে। করতলে বয়ন, নয়ন ঝরু নীরে।" কিন্তু কোন্ অজানা অপরাধের এই কঠোরতম দণ্ড! সকলেই পাইল শান্তিপুর যাইবার অনুমতি, অধিকার থাকিতেও তিনি পাইলেন নিষেধ। না হয় তাঁহার সঙ্গে প্রভু কথা নাই কহিতেন, তিনি একবার দূর হইতে তাঁহার দেবতাকে দেখিলেও কি সন্ন্যাসীর ব্রতভঙ্গ হইত! বিষ্ণুপ্রিয়া যতই এই সব কথা মনে তোলাপাড়া করেন ততই অভিমানে চক্ষে শ্রাবণের শতধারা ঝরে।

নিমাইকে দেখিয়া শচীমাতা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার আহার নাই, নিদ্রা নাই।

"সোঙরি সোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ।"

যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। কিন্তু শচীমাতার সেবা যত্নে আলস্য নাই। অন্তরে বিরহের হোমাগ্নি। শ্রীরাধার মন্দিরে মাধব বহুদিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মাধব কোন দিন আসিবেন না। না আসুন, তিনি তো তাঁহারই। এ জীবনে যদি মিলন না ঘটে—মরণের পর তো ঘটিবে। এই ভরসায় বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখের বরষা কাটাইতে লাগিলেন। অনুক্ষণ প্রিয়তমের ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন তাঁহার বিশ্বরূপ—"মিলনে নিখিল-হারা, বিরহে নিখিলময়।"

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেব নাম প্রচার করিতে নীলাচল যাত্রা করেন।

"সে কি প্রেমদান! সে কি নামগান!
পতিতের সে কি পাবনীলীলা!
সে কি অযাচিত মহাকারুণ্য!
সে কি অশ্রুজল! দ্রবিল শিলা।
কনকদণ্ড বাহু পসারিয়া অপূর্ব্ব সে কি নৃত্য শোভা!
অধরে মধুর হাস্য মাধুরী জগ-জন-মন-নয়ন- লোভা!"

বাংলায় নবযুগের সৃষ্টি হইল। রসস্রোতে আচণ্ডাল সকলেরই জীবনতরণী খেলা করিতে লাগিল। কিন্তু মূল্য দিলেন প্রেমপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া—হৃদয়ের রক্তে।

বৎসরান্তে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা মহাপ্রভুর সঙ্গসুখ লাভ করিতে নীলাচল যাইতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষের জল তাঁহাদের পথের ধূলা ধৌত করিয়া দিত। কবে তাঁহারা নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বল্লভের কথা বলিবেন তিনি সাগ্রহে সেই দিনটীর প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াই শচীমাতাকে নিমাইয়ের সংবাদ দিতেন।

চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধা জননী বারবার জিজ্ঞাসা করিতেন—"হ্যাঁ নিতাই, হ্যাঁরে গদাধর, আমার নিমাই ভাল আছে তো? খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় না তো। কত দিন বাছার চাঁদমুখখানি দেখিনি। এক দণ্ড যাকে ছেড়ে থাকলে জগৎ আঁধার দেখতাম—সে এখন বুড়ো মাকে ছেড়ে কোন্ তেপান্তরে রয়েছে।" তাঁহার প্রশ্নের শেষ হইত না। অন্তরাল হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের লীলাকথা শুনিয়া রস পানে বিভোর হইতেন। সেদিন সংসারের কাজকর্ম্মে ঘটিত অমনোযোগ। শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সে দিনটী কাটিত হর্ষবিষাদে।

"আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখায়।" শিক্ষাদাতার কার্য্যে ও কথায় ঐক্য না থাকিলে শিক্ষা ফলপ্রদ হয় না। জগদ্‌গুরু গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ এই জন্যই। কিন্তু সংসার আশ্রম ত্যাগ করিলেও তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে হৃদয় হইতে দূরে রাখেন নাই। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে যখনই প্রসাদী বহুমূল্য শাড়ী দান করিতেন, কোন না কোন ভক্তের হাত দিয়া তিনি তাহা শচীমাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বলিতেন—"এখানা মাকে দিয়ো।" কাহার জন্য সে কথা বলিতেন না। বুঝিতেন শচীমাতা। প্রিয়তমের প্রীতিচিহ্ন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণে আনন্দের তুফান তুলিত। শাড়ীখানিতে তিনি কান্তের স্পর্শসুখ পাইতেন।

"তোমারই বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী দীর্ঘ বরষ মাস।"

আনন্দের দিন, উৎসবের দিন, যেন আসিতে আসিতে চলিয়া যায়। দুঃখের দিন শেষ হইতে চায় না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটীর যেন অনন্ত পরমায়ু। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাধব-হীন কুঞ্জে কত মাধবী রাত্রি, কত গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ দিন, কত "মাহ ভাদর," শরতের শুভ্র আলো, হেমন্তলক্ষ্মীর দীপালিকা, শীতের দুরন্ত উত্তর বায়ু নিঃশব্দে আসিয়া দেবীদর্শন করিয়া

চলিয়া গেল। তিনি ধ্যানমগ্না—তাহারা কখন আসিয়া কখন চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলেন না।

পাঁচ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পাঁচটী যুগ। কবে স্বামী জন্মভূমি দেখিতে আসিবেন চিরবিরহিনী সেই শুভদিনের পথ চাহিয়া থাকিতেন। ব্যথাহারী অবশেষে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ছয় বৎসর পড়িতে গৌরাঙ্গদেব নদীয়ায় পদধূলি দিলেন। সুসংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাকে দেখিবার পুণ্যলোভে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। "নদীয়ার গোরা" বহুদিন পরে নদীয়ায়। সকলে আনন্দোন্মত্ত। অবিরাম হরি হরি ধ্বনি, নাম সঙ্কীর্ত্তন—বৈষ্ণবসজ্জন সেবা—মহোৎসবের বিরাট ব্যাপার। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর অন্তরতমের আসিবার পথে ধূলায় ধূসর। ক্ষণে উল্লাস ক্ষণে বিষাদ। উল্লাস—হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে বহুদিন পরে অন্তরাল হইতে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন। বিষাদ—তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য হইবে না। প্রিয়তমের সন্ন্যাস তাঁহাকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তা হোক, আজ তিনি দেখা না দিয়া স্বামীকে দেখিবেন ইহাই কি কম সৌভাগ্য!

অসংখ্য ভক্তকণ্ঠের হরিধ্বনি নিকটে—আরও নিকটে—আরও নিকটে আসিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহের প্রতি কণাটী চঞ্চল হইয়া উঠিল। কখন ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষে দাঁড়ান—কখন দুয়ারের পাশে সোৎসুক নয়নে পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নয়নলোভন জ্যোতির্ম্ময় কান্তি। সে রূপে রূপসী বিষ্ণুপ্রিয়া ডুবিয়া গেলেন। ভাসিয়া গেল লোকলজ্জার ভয়—মনের দ্বিধা। ভাঙ্গিয়া গেল স্বামীকে দেখা না দিয়া দেখিবার সঙ্কল্প। তিনি যে শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী কুলবধূ—এ বোধ রহিল না। মলিনবসনা সুন্দরী

অবগুণ্ঠনে আপাদমস্তক ঢাকিয়া চিরসুন্দরের চরণ তলে লুটাইয়া পড়িলেন। লোকে সবিস্ময়ে দেখিল রূপময়ের নিকটে এক রূপময়ী ভিখারিণী। সকলে নির্ব্বাক—নিস্পন্দ। সে কি ভিক্ষা চাহিবে শুনিতে সকলেই উৎসুক। গৌরাঙ্গ পিছাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি"। মৃদুকণ্ঠের উত্তর আসিল—"তোমার দাসীর দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া"। প্রিয়ার উত্তরে প্রিয় বলিলেন—"কি চাও তুমি।" কণ্ঠে বেদনার সুর। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। যাঁহার জন্য তিনি পাগলিনী যিনি তাঁহার নিত্য আরাধনার ধন—যিনি তাঁহার মনের সকল কথাই জানেন তাঁহারই এই প্রশ্ন! কিন্তু অভিমান করিলে চলিবে না। আজ যে তিনি ভিখারিণী। ভিক্ষা চাইই। সিক্ত নয়নে রিক্ত হাতে তিনি ফিরিবেন না। জগৎ উদ্ধার করিতে যিনি অবতীর্ণ, তাঁহার জীবনতরীর যিনি কাণ্ডারী, জীবের প্রতি যাঁহার দয়ার অন্ত নাই তাঁহার চরণে সাধ্বী আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। সংসারকূপে যে যেখানে পড়িয়াছিল সকলকেই দীনদয়াল উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু পড়িয়া আছেন একা অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যিনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন, উদ্ধারের দাবী যাঁহার সকলের আগে। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূর করুণ কণ্ঠের মর্ম্মস্পর্শী আবেদন শুনিয়া জনতা অভিভূত। নিস্তব্ধ অরণ্যে জাগিল বেদনার মর্ম্মর ধ্বনি। সকলের নয়নে নামিল আষাঢ়ের আসার। গৌরাঙ্গদেব বলিলেন "উদ্ধারের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তাঁহাকেই ভজনা কর।" বিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান জ্ঞান স্বামী। তাঁহার হৃদয়মন্দিরের একমাত্র দেবতা তিনিই। শ্রীকৃষ্ণের স্থান কোথায়! তিনি উত্তর দিলেন—"আমি তোমাকে জানি। তুমিই আমার শ্রীকৃষ্ণ।" ইহা তর্ক নয় বিশ্বাস; যুক্তি দিয়া ইহাকে খণ্ডন করা চলে না। সতী চায় পতি সেবার অধিকার। কিন্তু সে অধিকার দিবার অধিকার যে পতির

আর নাই। এবারের লীলা যে বিরহের। কিন্তু ভিক্ষা তো দিতে হইবে। নদীয়াবল্লভ আপনার খড়ম দুইটী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া বলিলেন "আমি সন্ন্যাসী, এ ছাড়া দিবার বস্তু কিছু নাই। কল্যাণি, এতেই যেন তোমার বিরহের শান্তি হয়।" বিষ্ণুপ্রিয়া যেন অমূল্য সম্পদ পাইলেন। খড়ম দুইটী সাদরে মাথায় রখিয়া সচুম্বনে বক্ষে ধরিলেন। এই তো তাঁহার পথের পাথেয়, তাঁহার অনাগত মিলনের ভরসা। আনন্দোন্মত্ত ভক্তমণ্ডলী বলিলেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর শ্রীচরণ দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে আপনার শূন্যমন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও যুগলীলা করিতে নদীয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই প্রথম ও শেষ "বাহির কৈনু ঘর।" ইহার পর আর কেহ তাঁহাকে বাটীর বাহিরে দেখিতে পায় নাই। জীবনবল্লভের পাদুকা পূজা করিয়া নিভৃতবাসিনী দেবী জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন। ত্রেতায় অগ্রজের পাদুকা সিংহাসনে বসাইয়া ভরত রাজ্যপালন করিয়াছিলেন—কলিতে পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া দয়িতের পাদুকাপূজায় সতীধর্ম্মের গৌরব বাড়াইয়া নীরবে এ জগত হইতে চিরমিলনের দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুঃখের মূল্যে জগত ধনশালী। সে ঋণ পরিশোধ হইবার নয়।

মাতাজী তপস্বিনী

যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহারা সুখদুঃখের অতীত কেন্দ্রে যে তত্ত্ব ও তথ্য লইয়া বাস করেন, সংসারীর প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ছন্দ ও সুর তাহার সঙ্গে মিলে না। তাঁহারা যে শিক্ষা দেন এবং কৃপাভিখারীকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন তাহার ফল পাকে পরলোকে। ইহলোকের নিত্যপ্রয়োজন সুখদুঃখের দোলায় দুলিতে দুলিতে কখন হাসে কখন কাঁদে; স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী নিয়তির খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেন। কারণ মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্তের প্রয়োজন বিভিন্ন।

ইহাই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পদ্ধতি। ক্বচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাক্ষাৎ ভগবতী মাতাজী তপস্বিনী সেই ব্যতিক্রম। দুরূহ মুক্তিতত্ত্ব বিশেষ অধিকারীর জন্য রাখিয়া তিনি হিন্দুসমাজের কল্যাণ কামনায় যে তত্ত্ব প্রচার করিতে কলিকাতায় পদধূলি দেন তাহা আধ্যাত্মিক নয়, স্ত্রীশিক্ষা—হিন্দুর গৃহে গৃহে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ বধূ, আদর্শ সহধর্ম্মিণী এবং আদর্শ জননীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সে আদর্শ ভারতেরই ছাঁচে গড়া—সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, অরুন্ধতী, দ্রৌপদী, কুন্তী, কৌশল্যা। বিদেশের প্রাণহীন অনুকরণ নয়। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হিন্দুকন্যাকে জাতীয় ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে পথে লইয়া যাইতেছিল তাহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। সে দুর্ভাবনা দূর করিতে মাতাজী নৈমিষারণ্যের নির্জ্জন বাস ছাড়িয়া কলিকাতার জনারণ্যে আগমন করেন। তাঁহার প্রয়োজনে নয়, দেশের প্রয়োজনে। "মহাকালী পাঠশালা" তাহারই আয়োজন।



মাতাজী তপস্বিনী

মাতাজী রাজবংশোদ্ভবা। তাঁহার পিতৃকুল দাক্ষিণাত্যে আর্কটের রাজা। মাতামহবংশ আর্নি দেশের ভূস্বামী। রাজসম্পদের ক্রোড়ে লালিতপালিতা মাতাজীর পূর্ব্বনাম ছিল সুনন্দাদেবী। রাজকন্যা হইলেও তাঁহার বিষয়বিভবের মোহ একেবারেই ছিল না। বিধাতা তাঁহাকে গৃহবাসিনী করিবার জন্য সংসারে পাঠান নাই ; সুনন্দাদেবীরও সেদিকে আগ্রহ ছিল না। সেইজন্য তিনি প্রথমে সুকঠোর পঞ্চাগ্নি ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত যে করে সে চিরদিন অনূঢ়া থাকে। আত্মীয়স্বজন রাজবালার সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নির্ব্বিঘ্নে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সুনন্দাদেবী তাম্রলিপ্তা নদীতীরে তপস্যা আরম্ভ করেন। বৎসরের পর বৎসর যায়, তপস্যার আর শেষ হয় না। শীত গ্রীষ্ম বরষায় যে ভাব, শরৎ হেমন্ত বসন্তেও সেই ভাব। সুদীর্ঘকাল পরে বিধাতা প্রসন্ন হন। তাঁহার তপশ্চর্য্যা শেষ হয় এবং তিনি মাতাজী তপস্বিনী নামে সুপরিচিতা হন। ইহার পর তিনি বহুদিন নৈমিষারণ্যে বাস করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পবিত্র তপোবনে তাঁহার নিকট বড় বড় ইংরাজ পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইত। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথা, সস্নেহ ব্যবহার এবং তপঃপ্রভাবে দর্শকের দল দারুণ উদ্বেগের দিনেও শান্তি পাইতেন।

নৈমিষারণ্য হইতে তিনি বৈদ্যনাথধাম দর্শন করিতে আসেন। তারপর কলিকাতায় উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি পুরীযাত্রা করেন এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। মাতাজীর সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বেদান্তে ব্যুৎপত্তি এবং জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া জজ্ শম্ভূনাথ পণ্ডিত, দ্বারিকানাথ মিত্র প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার ভক্ত হন। তাঁহাদের অনুরোধে

মাতাজী হিন্দুবালিকাদের জন্য একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ২০ জন ছাত্রী লইয়া কাজ আরম্ভ হয়। মাতাজী যে ভাবে তাঁহার এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির পুষ্টিসাধনে আপনাকে নিয়োজিত করেন তাহা হিন্দুসমাজের ভাবরাজ্যে যুগান্তর আনে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের প্রাণহীন শিক্ষার কুফল দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন একজন অশেষ গুণশালিনী সন্ন্যাসিনীকে সে বিষয়ে প্রধান উদ্যোগিনী দেখিয়া কন্যাকে যে পুত্রের মতই শিক্ষা দিতে হয় সে সত্য উপলব্ধি করেন। মাতাজী বিদুষী ত ছিলেনই, ললিতকলা এবং রন্ধনেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে "মহাকালী পাঠশালা" বিপুল সুখ্যাতি অর্জ্জন করে। কাশীমবাজারের রাণী হরসুন্দরীর কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাটীতে পাঠশালার জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সুযোগ্য ম্যানেজার রায়বাহাদুর শ্রীনাথ পাল মাতাজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে বাটীভাড়া লাগিত না; উপরন্তু দানশীলা মহারাণী মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন। ২।৩ বৎসর জোড়াসাঁকোর বাটীতে থাকিয়া পাঠশালাটী চোরবাগানে স্থানান্তরিত হয়। ছাত্রীর সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠে যে এখানেও স্থান সংকুলান হয় না। সকল পিতামাতা মহাকালী পাঠশালায় কন্যাকে পড়িতে দিতে ব্যগ্র। এমন কি, বিবাহ ব্যাপারে যে পাত্রী মাতাজীর পাঠশালার ছাত্রী তিনি পাত্রপক্ষের নির্ব্বাচনে বেশী ভোট পাইতেন।

কলিকাতার ও বাহিরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, রাজা, মহারাজা এই পাঠশালার পৃষ্ঠপোষক হন। তাঁহাদের আনুকূল্যে ইহা আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। এই বিষয়ে স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর স্যার লছমীশ্বর সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মাসে মাসে

৬০৲ টাকা চাঁদা এবং বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের সময় ১০০০৲ টাকা দিতেন।

ভাড়াটিয়া বাটীতে আবশ্যক মত স্থান না থাকায় এবং ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়া উঠায় মাতাজী পাঠশালার নিজস্ব বাটী নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে তিনি ঋণগ্রস্তা হন। এই দায় উদ্ধার করেন মহাপ্রাণ মহারাজা লছমীশ্বর।

মাতাজীকে দেখিলে ভক্তিতে মাথা স্বতঃই নত হইত। বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিতে আসিয়া তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা বলিতেন—মাতাজী ছদ্মবেশে সরস্বতী। নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান মাতাজী আপনার ভাবে আপনি বিভোর থাকিতেন। কে তাঁহাকে প্রশংসা করিল, কে করিল না, সে খপর রাখিতেন না। এই সব খপর রাখে—মন। তাঁহার সে মন ছিল কূটস্থ।

সন্ন্যাসীর কোন ঐহিক কর্ম্ম থাকে না। মাতাজীরও ছিল না। না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহার জীবন ছিল কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিধারার যুক্তবেণী। তিনি রাত্রি ৪টার সময় শয্যাত্যাগ ও স্নানাদি করিয়া পূজায় বসিতেন, উঠিতেন বেলা ৯ টায়। তাঁহার স্তোত্রপাঠ শুনিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। বাহ্যপূজাদির কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁহার; করিতেন যাহাতে অপরের স্বধর্ম্মে মতি হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"

উচ্চ অধিকারী যাহা করেন নিম্নাধিকারী তাহাই শিখে। তিনি য পথে চলেন, লোকে সেই পথের পথিক হয়। যুগাবতার রামকৃষ্ণ

তাঁহার ভক্তদের বলিতেন—"ওরে তোদের জন্যেই আমি সাততলা থেকে নীচের তলায় নামি। তোদের ত জানতে বাকী নেই আমার। আমি যদি করি ষোল আনা, তোরা কর্ব্বি এক আনা। আর যদি সব ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকি, তোরা 'পিপু ফিস্থু' হবি।"

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরণ।"

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তিনি নিম্নাধিকারীকে নিত্যনৈমিত্তিক পূজাদিতে প্রবৃত্ত রাখিবেন, স্বয়ং ঐ সব বহির্যাগের অনুষ্ঠান করিয়া। কদাচ বুদ্ধিভেদ ঘটিতে দিবেন না। ইহা ভগবানের আদেশ। মাতাজী সে আদেশ পালন করিতেন।

তাঁহার দিব্যভাবে ছাত্রীরা অনুপ্রাণিতা হইত। শিক্ষার সুফল ফলিত সেইজন্য। হিন্দুর গৃহে অধিষ্ঠাত্রীদেবী হইতে হইলে যে যে গুণের প্রয়োজন মাতাজী তাহার আয়োজন করিয়া রাখিতেন। পাঠশালার পড়া করিতে পারিলেই হইল, আর কিছু করিবার নাই এ ভ্রম কোন ছাত্রীর ছিল না। বারব্রত, পূজা, রান্নাবান্না, সূচীকাজ, গৃহকর্ম্ম, সকলই শিখিতে হইত তাহাদের। সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মানুরাগ, লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, শুদ্ধাচার, ভদ্র ব্যবহার—মাতাজীর দৃষ্টান্তে শিখিত তাহারা। তিনি বলিতেন—"ভারতের আদর্শেই ভারতের নারী গড়া চাই। ধার করিয়া আনা পোষাকপরিচ্ছদে তাহাকে সাজাইলে কুৎসিত দেখাইবে। বিলাতের নারী যাহা করে তাহা তাহার সমাজের চক্ষে সুন্দর এবং তাহার স্বধর্ম্ম। এ দেশে তাহা পরোধর্ম্ম এবং ভয়াবহ। যে শিক্ষা আপনার সমাজ ও ধর্ম্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাহা কুশিক্ষা।"

কলিকাতার মত ভারতের বহুস্থানে মাতাজী হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বলিতেন—"যে যুগ আসিতেছে তাহাতে

সকল ভগবতীরই বিদুষী হওয়া চাই।” বালিকারা তাঁহার নিকট ভগবতী আখ্যা পাইত।

মাতাজী পশুপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়া কিছুদিন নেপালেও ছিলেন। সেখানে তিনি গঙ্গাদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়া ও স্বর্ণাক্ষরে চতুর্ব্বেদ লেখাইয়া নেপালবাসীর ভক্তিভাজন হন। তাহারা তাঁহার নাম দেয় “গঙ্গা বাই।” বেদ-লিখনে বহু অর্থ ব্যয় হয়। নেপালের মহারাজা সে ভার বহন করেন। রাজপ্রাসাদে মাতাজী দেবীর পূজা পাইতেন।

দীর্ঘকাল নারীকল্যাণে ব্যাপৃত থাকিয়া মাতাজী কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। বাসন্তী পূজার সপ্তমী তিথির দিন তাঁহার দেহী জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণ করে। চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি যাঁহার প্রকাশে অক্ষম, যে আনন্দধামে পৌঁছাইলে পথিক ফিরিবার কথা ভুলিয়া যায়, বিশ্বনাথের সেই চিরসুন্দর পরমপদে তপস্বিনী মাতাজী বিলীন হন। তাঁহার কর্ম্মশূন্য কর্ম্মযোগের অবসান হয়।

বাংলার হিন্দু নরনারী তাঁহার নিকট চির-ঋণী। জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী মাতাজী কোন ধর্ম্মসঙ্ঘ না গড়িয়া, শিক্ষার ভিতর দিয়া হিন্দু বালিকাকে যাহা শ্রেয় সেই পথের সন্ধান দেন। নিদ্রিতাকে জাগাইয়া বলেন— “ওগো মেয়ে, ওগো মা, ওঠ, জাগো, তুমি যে শক্তি, তুমি যে শ্রী, তুমি যে কল্যাণী, তুমি যে অন্নপূর্ণা সে বিস্মৃত সত্য উপলব্ধি কর। শবকে শিব কর্ব্বার কাজে লাগো। সমাজ বাঁচুক, দেশ শ্রীসম্পন্ন হোক।” তাঁহার সে মৃত্যুহীন বাণী এখনও নীরব হয় নাই। যাহার কাণ আছে, হিন্দুসমাজের উপর টান আছে, সে শুনিতে পায়।

সারদেশ্বরী

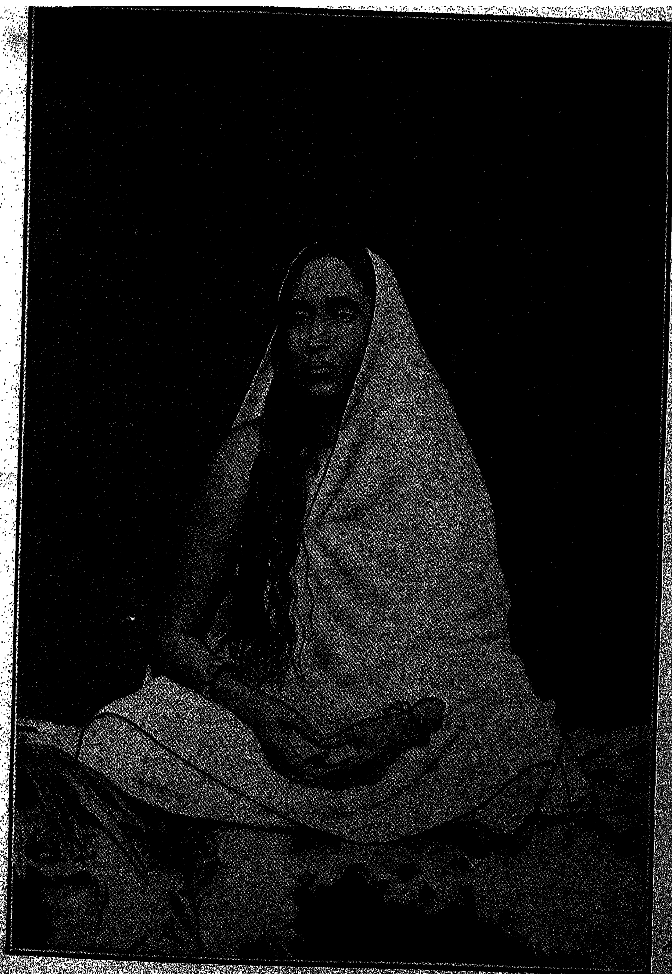
স্ত্রী কেবল গৃহিণী, সচিব ও সখী নয়—সে সহধর্ম্মিণী। স্বামীর ধর্ম্মাচরণে প্রধান সহায়। তন্ত্র বলে—কেবল সহায় নয়, স্ত্রী স্বামীর মহাশক্তি। তাহাকে বাদ দিলে দেবাদিদেব শিব পরিণত হন শবে, মানুষ তো কোন ছার। উপনিষদ বলে—স্বামী ও স্ত্রীর অন্তর্-রাজ্যে সত্য শিব ও সুন্দর বিরাজ করেন বলিয়াই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে প্রেমের "নিকষিত হেম" শতদল বিকশিত হইয়া উঠে। তখন চণ্ডীদাসের কথায় "এ দেহ সে দেহ একই রূপ"; এক আর একের যোগফল এক—তা গণিতশাস্ত্র যতই প্রতিবাদ করুক।

দাম্পত্যজীবনের এই দিব্যভাব যুগাবতার রামকৃষ্ণ ও তাঁহার স্ত্রী সারদেশ্বরীর জীবনে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও রামকৃষ্ণ স্ত্রীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান নাই; আপনার কাছে রাখিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর "শ্রীশ্রীমা"তে পরিণত করিয়া হরগৌরী মিলনের পবিত্র আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সারদেশ্বরীও সহধর্ম্মিণী নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নারীজীবনের এক নূতন বেদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সত্য বটে দিবালোকে চন্দ্রকিরণের মত রামকৃষ্ণের দিগন্তব্যাপী অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিতে সারদেশ্বরী নিষ্প্রভ কিন্তু তাঁহার নিষ্কাম সাহচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যা যে রামকৃষ্ণকে মহাশক্তি দিয়াছিল ইহা অস্বীকার করা চলে না।

উভয়ের শুভমিলন ঘটে ১২৬৬ সালে, বৈশাখের শেষের দিকে। রামকৃষ্ণের জন্ম ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন;* সারদেশ্বরীর ১২৬০

---

* "রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" অনুসারে পরমহংসদেবের জন্ম ১২৪২ সাল ৬ই ফাল্গুন।



সারদামণি দেবী।

সালের ৮ই পৌষ। সুতরাং বিবাহের সময় স্বামীর বয়স ২৫ ও স্ত্রীর বয়স (ছয়) ৬ ছিল।* রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর। হুগলী জেলা। এই গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটী। বাঁকুড়া জেলা। সারদেশ্বরীর পিত্রালয়।

বাল্যকালে রামকৃষ্ণের আর এক নাম ছিল গদাধর। গদাধরের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তিন পুত্র, দুই কন্যা ও স্ত্রী চন্দ্রমণিকে রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। তিন পুত্রের মধ্যে রামকুমার জ্যেষ্ঠ, রামেশ্বর মধ্যম ও গদাধর কনিষ্ঠ। অস্বচ্ছল অবস্থা। ১২৫৫ সালে রামকুমারের পুত্র অক্ষয় জন্মলাভ করে ও তিনি বিপত্নীক হন। সংসারের অভাবঅনটন দূর করিতে ১২৫৬ সালে রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী খোলেন। গ্রামে গদাধরের লেখাপড়ার উন্নতি না হওয়ায় ১২৫৯ সালে রামকুমার তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া আপনার কাছে রাখেন। ১২৬২ সালে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রামকুমারকে জগন্মাতার পূজার ভার দেন। তখন হইতে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রাম আসিয়া উপস্থিত হয়।

---

* ১৩০৮ সালের ২০শে ভাদ্র তারিখে মুদ্রিত "রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত" নামক পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে :—

"ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরিবারস্থ অভিভাবকেরা রামকৃষ্ণের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণের আনন্দ হইয়াছিল। বিবাহ কি, কেন বিবাহ আবশ্যক, তাহা তিনি জানিতেন না, সুতরাং কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত রামকৃষ্ণের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া যায়, পাত্রীর নাম শ্রীমতী সারদামণি দেবী। বিবাহের সময় সারদামণির বয়ঃক্রম আট বৎসর।"

১২৬৩ সালে রামকুমারের মৃত্যু হইলে গদাধর জগদম্বার পূজারী হন। পূজা করিতে করিতে তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়। "ছোট ভট্চায" পূজা করিতে বসিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন; আপনার যড়ঙ্গে জবা বিল্বদল স্পর্শ করাইয়া জগদম্বার পাদপদ্মে দেন; কখন হাসেন, কখন মা মা বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন, কখন ভাবাবেশে নৃত্য করেন। সংবাদ পাইয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে কামারপুকুরে লইয়া আসেন। ক্রমে ব্রহ্মময়ীর দেখা পাইয়া গদাধর সুস্থির হন। কিন্তু সংসারে বিতৃষ্ণা ও কেমন একটা "আড়ো-আড়ো-ছাড়ো-ছাড়ো" ভাব লাগিয়াই থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে অনেকেরই ইহা হয় কিন্তু পরে থাকে না। বিবাহ দিলে গদাধরের উদাসী মন সংসারে বসিবে এই বিশ্বাসে চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর পাত্রীর সন্ধান করিতে থাকেন। অবশেষে জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদেশ্বরীকে মনোনীত করিয়া রামচন্দ্রের সহিত কুটুম্বিতা পাকা করিয়া ফেলেন এবং শুভদিন দেখিয়া গদাধর ও সারদাদেবীর চারি হাত এক করিয়া দেন। বিবাহের পর গদাধর কামারপুকুরেই থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিলে যদি বায়ুরোগ পুনরায় আক্রমণ করে এই ভয়ে চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সাধনার পীঠে আসিতে দেন নাই। বিবাহের এক বৎসর পরে ১২৬৭ সালে গদাধর ও হৃদয়ের সঙ্গে সারদেশ্বরী শ্বশুর বাড়ী আসেন। ইহার কিছুদিন পরে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কালীর পূজায় ব্রতী হন। দ্বৈত ভাবের সাধনা শেষ করিয়া তিনি অদ্বৈত ভাবে সিদ্ধিলাভ করেন ও তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে; সারদেশ্বরী পিত্রালয়ে।

১২৭৪ সালে রাণী রাসমণির জামাতা ভক্ত মথুরবাবুর কাতরতায় তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জগদম্বার কঠিন গ্রহণীরোগ যোগবলে আরোগ্য করিয়া রামকৃষ্ণ স্বয়ং অসুস্থ হন। ছয় মাস রোগভোগের পর মথুর

বাবু ও জগদম্বা তাঁহাকে কামারপুকুরে পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে প্রবাসীর স্বগৃহ আগমনে কামারপুকুরে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সাধনার কথা লোকের মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া যে বিকৃত আকার ধরিয়াছিল তাঁহাকে দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব রহিল না। তাঁহার পূর্ব্বের মত অমায়িক ব্যবহার, সরল কথাবার্ত্তা, ধর্ম্মানুরাগ ও সত্যনিষ্ঠায় আবালবৃদ্ধ পরিতৃপ্ত হইল। কামারপুকুর এতদিন যেন অন্ধকার হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ আসিয়া তাহা দূর করিয়াছেন গ্রামবাসীর এইরূপ মনোভাব। রমণীদের অনুরোধে রামেশ্বর জয়রামবাটীতে লোক পাঠাইলেন সারদেশ্বরীকে আনিতে। রামকৃষ্ণের দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। শুনিয়া বিরক্তি বা আনন্দ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। অনতিবিলম্বে সারদেশ্বরী স্বামীর সেবা করিতে শ্বশুর বাড়ী আসিলেন। ধরিতে গেলে ইহাই তাঁহার প্রথম স্বামীসন্দর্শন। দ্বিরাগমনের সময় তিনি একবার মাত্র স্বামীর দেখা পাইয়াছিলেন। তখন বয়স মোটে সাত বৎসর। এখন চৌদ্দ। ইতিমধ্যে তিনি আরও দুইবার কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রাদেবী ও রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকায় তাঁহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই।

সন্ন্যাসগ্রহণের সময় রামকৃষ্ণ শিক্ষাগুরু তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন তিনি বিবাহিত। গুরু সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন উহাতে কিছুই আসে যায় না। স্ত্রীও যে বস্তু, স্বামীও তাই। ব্রহ্মের অংশ। ভেদবুদ্ধি ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিঘ্ন। স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার বৈরাগ্য, বিবেক ও সাধনা অক্ষুন্ন থাকে সেই প্রকৃত বীর ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী। যোগক্ষেম রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরীকে নিকটে পাইয়া এক দিকে আপনার ব্রহ্মবিজ্ঞান পরীক্ষা অন্যদিকে কিশোরী স্ত্রীকে গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। ইহাই

রামকৃষ্ণদেবের বৈশিষ্ট্য। দেবতা ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া যে বালিকার পাণিগ্রহণের সঙ্গে তাহার ইহকাল পরকালের দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার উপযুক্ত না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি তিনই সমান পূজ্য; ইঁহাদের সেবা গৃহস্থের কর্ত্তব্য; লোকজনের সঙ্গে কেমন করিয়া মিশিতে হয়; ভোগ ভাল কি ত্যাগ ভাল; ঈশ্বর কে ও কি করিলে তাঁহাকে লাভ হয়; এইরূপ নানা বিষয় রামকৃষ্ণ এমন সহজ ভাবে সারদেশ্বরীকে বুঝাইতেন যে তাহা অনায়াসে তাঁহার বোধগম্য হইত। কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বামীর কথা শুনিতেন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বোপরি জীবন্মুক্ত স্বামীর পবিত্র সঙ্গ ও আদর যত্নে সারদেশ্বরী আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেন।

প্রায় সাতমাস কামারপুকুরে কাটাইয়া রামকৃষ্ণ সুস্থশরীরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। সারদেশ্বরী জয়রামবাটীতে আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত রামকৃষ্ণের কাছে। কবে তিনি আবার ডাকিবেন সাগ্রহে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় তাঁহার কাল কাটিত। এদিকে বয়ঃক্রম যৌবনের সীমানায় উপস্থিত হইল। পল্লীগ্রাম। রমণীরা বলিত "কেমন জামাই, বাপু! বৌ নিয়ে যায় না।" পুরুষেরা বলিত "রামচন্দ্রের যেমন কাণ্ড; একটা পাগলের সঙ্গে দিয়েছে মেয়ের বিয়ে।" সারদেশ্বরীর জননীও আক্ষেপ করিতেন—"এমন জামাই করলাম—ঘরসংসার করে না।" তাঁহার রাগ পড়িত রামচন্দ্রের উপর। বলিতেন—"তখন যে ৩০০ টাকার লোভে মেয়ের সাত তাড়াতাড়ি বে দিলে, জামায়ের একটা খোঁজ খপর নিলে না; এখন সোমত্ত মেয়ে ঘরে পোষ।" সমবয়সী যুবতীরা সারদেশ্বরীকে "পাগলের বৌ" বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশের ছলে উপেক্ষা

করিত। ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড় বাজিত কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না এবং পাছে পতিনিন্দা শুনিতে হয় বলিয়া কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না। কখন কখন উন্মনা হইয়া ভাবিতেন তবে কি লোকে যাহা বলে তাহাই ঠিক, তিনি আর পূর্ব্বের মত নাই ? কিন্তু তাঁহার অন্তর বলিত লোকের কথা মিথ্যা।

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমা গৌরাঙ্গদেবের জন্মতিথি। ১২৭৮ সালে সারদেশ্বরীর দুইচারিজন আত্মীয়া গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় আসিবার সঙ্কল্প করেন। শুনিতে পাইয়া সারদেশ্বরী বলিলেন তিনিও গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন। আত্মীয়েরা রামচন্দ্রকে কন্যার ইচ্ছা জানাইয়া বলিলেন যে যদি তাঁহার কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে সারদাকে তাঁহারা লইয়া যাইবেন। সে যে কেন কলিকাতায় যাইতে চায় বুঝিতে পারিয়া রামচন্দ্র বলিলেন যে সকন্যা তিনিও সহযাত্রী হইবেন।

রেলগাড়ীর সুবিধা নাই। পাল্কী ব্যয়সাধ্য। সুতরাং রামচন্দ্র কন্যা ও গঙ্গাস্নানার্থিনীদের লইয়া হাঁটিয়াই কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রথম দুইদিন পান্থগণের আনন্দে কাটিল কিন্তু যাত্রা শেষ পর্য্যন্ত তাহা স্থায়ী হইল না। মুস্কিল হইল সারদেশ্বরীকে লইয়া। দীর্ঘ পথের অনভ্যস্ত ক্লান্তিভারে তিনি দারুণ জ্বরে পড়িলেন। উদ্বিগ্ন রামচন্দ্র অগত্যা এক চটিতে কন্যাকে লইয়া রহিলেন। পরদিন জ্বর ছাড়িয়া গেল। রামচন্দ্র দেখিলেন পথের মাঝে রুগ্না কন্যাকে লইয়া বসিয়া থাকায় কোন লাভ নাই বরং লোকসান আছে। এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই ভাল। সারদেশ্বরীর প্রাণ স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তিনিও উহাতে মত দিলেন। ভাগ্যক্রমে কিছুদূর যাইতে না যাইতেই একখানি পাল্কী জুটিয়া গেল। কিন্তু হাঁটিতে না হইলেও সারদেশ্বরীর আবার জ্বর আসিল। তবে প্রকোপ মৃদু বলিয়া তিনি সে কথা চাপিয়া গেলেন।

অবশেষে দীর্ঘ পথ ফুরাইল। সকলে যখন দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন তখন রাত্রি ৯টা। রামকৃষ্ণ সকলের যথোচিত আদর অভ্যর্থনার পর পত্নীকে অসুস্থ দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি জ্বর বাড়ে এই জন্য আপনার শয়নকক্ষে পৃথক বিছানায় সারদেশ্বরীর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং গত শ্রাবণে পরম ভক্ত মথুরামোহনের মৃত্যু না হইলে আজ তাঁহাকে দেখিয়া সে যে কত আনন্দিত হইত ও কিরূপ যত্ন করিত সেই আক্ষেপ বারবার করিতে লাগিলেন। যাহাহউক, ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে ও রামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে সারদেশ্বরী তিন চারি দিনেই নিরাময় হইলেন। এই কয় দিন তিনি স্বামীর শয়ন-কক্ষেই শয়ন করিতেন। সারিয়া উঠিলে রামকৃষ্ণ চন্দ্রাদেবীর নিকট নহবতঘরে সারদেশ্বরীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সাধ্বী বুঝিলেন লোকে তাঁহার স্বামীর নামে যে কথা রটনা করে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তেমনই আছেন।

বৎসরাধিককাল স্বামী সেবা করিয়া সারদেশ্বরী কামারপুকুর ফিরিয়া যান। তিনি আসিবার অল্প দিন পরে রামেশ্বর স্বর্গলাভ করেন। দ্বিতীয়বার সারদেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া এক বৎসর ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আমাশয় রোগ হয়। শম্ভুবাবু বহু যত্নে তাঁহার চিকিৎসা করাইতে থাকেন। একটু সুস্থ হইলেই রামকৃষ্ণ তাঁহাকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাঁহার রোগ এত বাড়ে যে তাঁহার বিধবা মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন। পরে তিনি দৈব ঔষধে নিরাময় হন। তাঁহার পীড়ার যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা তখন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার শাশুড়ী চন্দ্রাদেবী গঙ্গালাভ করেন। চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে কন্যার মত ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে সারদেশ্বরী যার পর নাই কাতর হন।

রামকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে জয়রামবাটী গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। সারদেশ্বরীর মাতা প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন—'এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা, ঘর-সংসারও করলে না, ছেলে পিলেও হ'লো না, মা বলাও শুনলে না।" একবার রামকৃষ্ণ শাশুড়ীর আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"মা আপনি দুঃখ কর্ব্বেন না—আপনার মেয়ের এত ছেলে মেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।" হইয়াছিলও তাই। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ত-সন্তান তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

বহুদিন জয়রামবাটীতে কাটাইয়া সারদেশ্বরী সুস্থ শরীরে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন রামকৃষ্ণদেবের চিহ্নিত ভক্তবৃন্দ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি একা আসেন নাই। সঙ্গে রামকৃষ্ণের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং আর কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও সারদেশ্বরী হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। দুই তিন দিনের পথ; মধ্যে ৪।৫ ক্রোশ বিস্তৃত তেলোভেলো ও কৈকলার মাঠ—ডাকাইতের আড্ডা। এই বিপৎসঙ্কুল মাঠের নিকটে আসিয়া সারদেশ্বরী পথশ্রমে পিছাইয়া পড়েন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই যমপুরীতুল্য মাঠ পার হইতে না পারিলে ডাকাইতের হাতে প্রাণ যাইবে; এদিকে সারদেশ্বরী যে ভাবে চলিতেছিলেন তাহাতে মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইবে। সঙ্গীদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখিয়া সারদেশ্বরী বলিলেন—"তোমরা আর আমার জন্যে দাঁড়িয়ো না। একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌছে জিরোওগে। আমার জন্যে ভাবনা নেই। আমি যত শীঘ্র পারি নাগাল ধর্ব্ব।" সন্ধ্যা হয় দেখিয়া তাহারা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। সারদেশ্বরী সাধ্যমত দ্রুত চলিতে লাগিলেন কিন্তু মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি ভাবিয়াছিলেন

সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই দস্যুসঙ্কুল মাঠ পার হইয়া যাইবেন, তাহা আর ঘটিল না। কুলবধূ; জনহীন মাঠ; অন্ধকার ঘনায়মান। তাঁহার অবস্থা "ন যযৌ ন তস্থৌ।" কিন্তু অনিশ্চিতের পথ দিয়াই নিশ্চিত আসে; ভয়ের স্তব্ধতার মাঝেই অভয়ার অভয়বাণী মন্দ্রিত হয়। সারদেশ্বরী দেখিতে পাইলেন অমাবস্যার মত কালো, ভীষণবপু একজন পুরুষ লাঠি কাঁধে তাঁহার দিকেই আসিতেছে। তাহার সঙ্গে একজন রমণী। বিপন্না সারদেশ্বরী বুঝিলেন ইহা ব্রহ্মময়ীর খেলা। ভয়ের কারণ নাই। লোকটা জিজ্ঞাসা করিল –"কে গা তুমি এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে? কোথা যাবে?" সহজ কণ্ঠে সারদেশ্বরী বলিলেন—"বাবা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। পথ হারিয়েছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, আমি সেইখানে যাব। সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে।"

পুরুষটী একজন বাগ্দী পাইক। সে ও তাহার স্ত্রী সারদেশ্বরীর সরলতা ও নির্ভরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পাইক বলিল—"ভয় কি মা, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। তা, সঙ্গীরা কোন চটীতে থাকবে?" সারদেশ্বরী বলিলেন, "তারকেশ্বরে"। পাইকের স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিল "এ মাঠ পেরিয়ে যে গাঁ পড়বে সেইখানে আজ আমরা মেয়েকে নিয়ে থাকবো। কাল তারকেশ্বরে গেলেই হবে।" তাহাই হইল। পরদিন বাগ্দীবাবা ও মায়ের সঙ্গে সারদেশ্বরী তারকেশ্বরে স্বজনের সঙ্গে মিলিতা হইলেন ও তাহারা যে কি উপকার করিয়াছে তাহা শতমুখে বলিতে লাগিলেন। বিদায়বেলায় সারদেশ্বরী তাঁহার পথে-পাওয়া বাবাকে অনুরোধ করিলেন যে সুবিধা মত সে যেন সস্ত্রীক তাঁহাকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসে। তাহারা স্বীকার করিল যে দক্ষিণেশ্বরে যাইবে। তারপর তাহারা গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। কিন্তু সারদাকে তাহারা ভোলে নাই। নানা সামগ্রী লইয়া তাঁহাকে দেখিতে কয়েকবার

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল। পত্নীর মুখে তাহাদের কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণও বাগ্দীদম্পতিকে অত্যন্ত আদরআপ্যায়ন করিতেন।

সারদেশ্বরী সরলা পল্লীবালা, লেখাপড়ার ধার ধারিতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের শিক্ষায় ও আপনার সাধনায় যে বিদ্যা শিখিলে জগতে অবিদ্যার ভয় থাকে না তাহা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধি ছিল গভীর, দৃষ্টি ছিল অন্তর্নিহিত।

সারদেশ্বরীর নির্লোভিতাও প্রশংসার যোগ্য। একজন মাড়োয়ারী ভক্ত-নাম লছমীনারায়ণ—একবার রামকৃষ্ণকে দশ হাজার টাকা দিতে আসে। তাঁহার কাছে টাকা ও মাটী এক বস্তু। পত্নীর হৃদয়ের বল পরীক্ষা করিতে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"গ্যাখো, এই ভক্তটী দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। নেব না শুনে বলছে তোমাকে ঐ টাকা দেবে। তা, তুমি নেবে কি?" সারদেশ্বরী বলিলেন—"তা কি হয়? আমি নিলেও তো তোমারই নেওয়া হবে। তুমি মহাত্যাগী; লোকে সেইজন্য ভক্তিশ্রদ্ধা করে। টাকা নিয়ে কি হবে? ও সব আমাদের চাইনে।"

যাঁহাকে অর্থাভাবে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দীর্ঘপথ হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিতে হইত, ভাল বিছানার অভাবে চটের উপর মাছুর পাতিয়া পাটের ফেঁসোর বালিস মাথায় দিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত তাঁহার পক্ষে এই নিস্পৃহতা কম গৌরবের বিষয় নয়।

দেহ থাকিলেই রোগ হয়। পরমহংসদেবের গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দেয়। ডাক্তার বৈদ্য হার মানে এমনই রোগ। দক্ষিণেশ্বরে চিকিৎসার অসুবিধা বলিয়া ভক্তেরা তাঁহাকে শ্যামপুকুরে লইয়া যান। সেখানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার করেন চিকিৎসা, ভক্তেরা সেবা। ব্যবস্থামত পথ্য প্রস্তুত না হওয়ায় তাঁহারা সারদেশ্বরীকে শ্যামপুকুরে

লইয়া আসেন। এক মহল বাটী। পরিচিত, অপরিচিত লোকে পরিপূর্ণ। লজ্জাশীলা সারদেশ্বরীর অনেক অসুবিধা হইত কিন্তু লজ্জা-সঙ্কোচের সময় নয়। তিনি প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতেন। উঠিতেন রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে, শুইতেন রাত্রি ১১টার পর। ভক্তেরা শ্যামপুকুর হইতে রামকৃষ্ণদেবকে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ তিনি মহাসমাধি লাভ করেন।

স্বামী-শোকে অধীরা সারদেশ্বরীকে লইয়া ভক্ত-সন্তানেরা তীর্থভ্রমণে বাহির হন। কাশী হইয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় এক বৎসর থাকেন। বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে সারদেশ্বরী সংবাদ পান মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বিশ্বাস মাসে মাসে তাঁহাকে যে সাতটী করিয়া টাকা দিত কর্ম্মচারীরা তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শুনিয়া তিনি বলেন "করুক গে বন্ধ। আমার ঠাকুরই চলে গেছেন। টাকা নিয়ে আর কি কর্ব্ব।" বৃন্দাবন হইয়া তাঁহারা হরিদ্বার যাত্রা করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সারদেশ্বরী বলরাম বাবুর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া কামারপুকুর রওনা হন। তখন তিনি "শ্রীশ্রীমা"—অসংখ্য ভক্তের স্নেহময়ী জননী—ইষ্টদেবী।

জননীর দেহান্তে রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরীকে গয়ায় পিণ্ডদান করিতে বলিয়া ছিলেন। কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সারদেশ্বরী বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাস করেন। তারপর স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে গয়া গিয়া স্বামীর আদেশ পালন করেন।

সচ্চিদানন্দময় স্বামীর সহিত অমরলোকে পুনর্ম্মিলনই ছিল তাঁহার কাম্য। তিনি রোগশয্যায় প্রায়ই ভক্তদের বলিতেন "এখন প্রাণ কেবল ঠাকুরকেই চায়; আর কিছুই ভাল লাগে না।" অবশেষে ঠাকুর ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসরের সাধ্বী পত্নীকে দিব্যধামে লইয়া যান।

*রামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি ৩৪ বৎসর ধরিয়া অসংখ্য ভক্তকে করুণাধারায় কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল ভক্তকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই তিনি জননী। একবার দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন মধ্যাহ্ন ভোগের সময় দূর-দেশী তিন-জন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। তাহারা দীন দরিদ্র। ভিক্ষা করিয়া পথ খরচ চালাইয়া একবস্ত্রে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ সারদেশ্বরীর সঙ্গে গোপনে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের কথা বলিতে থাকে। কথা আর ফুরায় না। এদিকে ভোগের বেলা যায়। অন্যান্য ভক্তেরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একজন বিরক্তি চাপিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"দেখুন, মা এখন ভোগ দেবেন। সময় হয়ে গেছে। আপনার এখনও যদি বলবার কিছু থাকে তবে নীচে সন্ন্যাসী মহারাজদের বলুন গে।" সারদেশ্বরী তাহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "তুমি তো বেশ, বাবা। ভোগ না হয় দেরীতেই দেব। ওরা কত দূর থেকে কত কষ্ট করে এসেছে, ওদের কথা আগে না শুনলে ঠাকুর কি মনে কর্ব্বেন।" ভিন্ন-দেশী ভক্তের কথা শুনিতে ও সাধনভজনের উপদেশ দিতে সত্যই ভোগের বহু বিলম্ব হইয়া গেল। তাহারা প্রসাদ পাইয়া হৃষ্টমনে বিদায় গ্রহণ করিলে সারদেশ্বরী বলিলেন —"ওরা বড্ড গরীব—কত দুঃখ কষ্ট সয়ে এসেছিল। ওদের কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনলে ওদের কত কষ্ট হোত—ঠাকুরও দুঃখ পেতেন।" তিনি পতিতাকেও কৃপা করিতেন। বলিতেন "পাপ করে যার অনুতাপ আসে তার পাপ আর থাকে না। ঠাকুর তাকে কৃপা করেন।"

সারদেশ্বরীর মত সেবাপরায়ণা, ত্যাগশীলা, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী যে বাংলার ঘরে ঘরে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

রাণী ভবশঙ্করী

(রায়বাঘিনী)

বীরনারী রাণী ভবশঙ্করী "বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে"। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পেড়ুয়াগড়ের নাতি-দূরে ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা দীননাথ চৌধুরী ছিলেন এই গড়ের একজন সর্দ্দার। শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, শস্ত্রচর্চ্চা ক্ষত্রিয়ের। দীননাথ দুইই করিতেন। মসিজীবি বাঙালী তখন অসিজীবি ছিল। দেহে অমিত বল, বাহুতে দুর্জ্জয় শক্তি, রণদক্ষ দীননাথ বীরের মর্য্যাদা পাইতেন। তাঁহার অধীনে বহু সৈন্য থাকিত।

শৈশবেই ভবশঙ্করীর মাতৃবিয়োগ ঘটে। সেইজন্য দীননাথ তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতেন না। যেখানে যাইতেন কন্যাকে সঙ্গে লইতেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে, পাশে রণবেশে বসিয়া ভবশঙ্করী। ভয় নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই। সুন্দর মুখে উল্লাসের চিহ্ন। দীননাথ সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতে ব্যস্ত, ভবশঙ্করী উহা আয়ত্ত করিতে অনন্যমনাঃ। চিত্তের প্রবণতা বুঝিয়া শিক্ষা দিলে সুফলই ফলে। কন্যাকে শস্ত্রজ্ঞা করিবার ভার আপনার হাতে রাখিয়া দীননাথ তাঁহার অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার ভার দেন গৃহশিক্ষকের হাতে।

পিতার শিক্ষায় ভবশঙ্করী অল্প বয়সেই অস্ত্র প্রয়োগে অসীম নৈপুণ্য লাভ করেন। রণ সাজে সাজিয়া তিনি যখন অশ্বপৃষ্ঠে কোথাও যাইতেন লোকে বলিত 'মা ভবানী ছলনা করিতে চৌধুরীর ঘরে আসিয়াছেন।' বীরবালা বীরপতি কামনা করে। নিত্য শিবপূজান্তে ভবশঙ্করী দেবাদি-দেব আশুতোষের নিকট সেই কামনা জানাইতেন।

ক্রমে যৌবন দিল দেখা। লাবণ্যের বন্যায় তনুখানি গেল ডুবিয়া। বিবাহ হয় না। ভবশঙ্করীর পণ ছিল, যে ব্রাহ্মণসন্তান বীরত্বে ও বিদ্যায় তাঁহাকে পরাজিত করিবে তাঁহারই গলায় তিনি বরমাল্য দিবেন। দীননাথ এ কথা জানিতেন। সেইজন্য তিনি ভবিতব্যতার হাতে বিবাহের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কেহ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন—"পাত্র পেলেই তো মেয়ের বিয়ে দিই। পাচ্ছি কৈ! যার তার হাতে তো মাকে আমার দিতে পারি নে।" তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও শস্ত্রজ্ঞ। সুতরাং কেহ বেশী কিছু বলিতে পারিত না।

ভবশঙ্করী প্রায়ই অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে যাইতেন। একদিন তিনি দামোদরের শাখা রোণনদীর তীরস্থ কুলাকাশের গহন বনের ধারে উপস্থিত হইয়া একটী হরিণকে বর্ষাক্ষেপে নিহত করেন। ঐ সময়ে তিন চারিটী ভীষণাকৃতি বন্য মহিষ নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার অশ্বকে আক্রমণ করে কিন্তু বীরবালার অব্যর্থ বর্ষা নিক্ষেপে একে একে সকলেরই হরিণের দশা হয়। তিনি যখন শেষ মহিষের জীবন-শেষ করেন তখন গড় ভবানীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় নৌকাযোগে কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে যাইতেছিলেন। নৌকা হইতে মানবী মহিষ-মর্দ্দিনীকে দেখিয়া রাজা বিস্ময়বিমুগ্ধ হন এবং ঘাটে নৌকা লাগাইয়া তিনি তীরে নামিয়া ভবশঙ্করীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ভবশঙ্করী অপ্রতিভ। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে কাটশাঁকড়ার শিবমন্দিরে পূজা দিতে গিয়া তিনি যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা তিনিই—রাজা রুদ্র-নারায়ণ। নির্জ্জন নদীতীরে মৃগয়ায় আসিয়া যে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ রাজার সম্মুখে পড়িবেন এবং তাঁহাকে রাজপ্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ইহা কল্পনাতীত। যাহা হোক, তিনি ধীরে ধীরে আপনার যথাযথ পরিচয় দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া গৃহমুখে অশ্বচালনা করেন।

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যে রাজার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। ভবশঙ্করী চলিয়া গেলে তিনি নৌকারোহী হন। মন্দিরে পৌঁছিয়া কোথায় তিনি দেবতার ধ্যান করিবেন, না অশ্বপৃষ্ঠে মানবী মহিষমর্দ্দিনীর ছবি মানসপটে দেখিতে পান। অবাধ্য মন কিছুতেই দেবতার রূপসাগরে ডুব দিতে চায় না। অথচ চিত্তজয় করিয়া নিত্যবস্তু লাভের জন্যই শিবতুল্য দীক্ষা-গুরু শ্রীশ্রীহরিদেব ভট্টাচার্য্যের উপদেশে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

রাজা রুদ্রনারায়ণ ছিলেন অপুত্রক। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে দ্বিতীয়া পত্নী হইতে তাঁহার বংশরক্ষা হইবে। ভাবী রাণী মহাবীর্য্যবতী—মহামায়ার অংশরূপা। তাঁহার রাজ্যেই সে কন্যার বাস। বিবাহের পূর্ব্বে রাজা তাঁহার দেখা পাইবেন।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন তবে কি এই বীরবালা তাঁহার সেই ভাবী রাণী? কিন্তু যুবতী সধবা কি কুমারী তাহা লক্ষ্য করিবার তো তিনি অবকাশ পান নাই! ভাবিয়া কোন কূলকিনারা না পাইয়া রাজা দীননাথ চৌধুরীর নিকট দূত পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে তিনি দীননাথের সাক্ষাৎ প্রয়াসী। বিশেষ প্রয়োজন। তিনি যেন কালবিলম্ব না করিয়া কাটশাঁকড়ায় আসেন।

দূতমুখে সংবাদ পাইয়া দীননাথ সন্ধ্যাবন্দনার পর দ্রুতগামী অশ্বে রাজদর্শনে আসিলেন। লৌকিক শিষ্টাচারের পর রাজা দীননাথকে তাঁহার কন্যার বীরত্বের কথা বলিয়া কৌশলে আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন। বিদায়কালে ভরসা দিলেন যে ভবশঙ্করীর জন্য তিনি যোগ্য পাত্র সন্ধান করিয়া দিবেন। দীননাথ বলিলেন—"সে আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু আমার মায়ের পণ, যে তাহাকে অসি যুদ্ধে হার মানাবে তারই গলায় সে মালা দেবে। যে-সে পাত্র সে চায় না। বয়স্থা মেয়ে তার অমতে কোন কিছু করা তো ভাল হয় না।"

ভবশঙ্করী অনূঢ়া জানিয়া রাজার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। নিরাশাও যে না জাগিল তাহা নয়। প্রথমা রাণীর দিক হইতে আপত্তির সম্ভাবনা নাই। সপত্নী আসিলে যদি বংশরক্ষা হয় তবে সে যত শীঘ্র আসে ততই ভাল। ইহাই প্রৌঢ়ার মনোভাব। আপত্তি করিতে পারে ভবশঙ্করী। রাজার বয়স বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌঁছিয়াছে—সে যুবতী। তারপর অসিযুদ্ধ। একজন সর্দ্দারকন্যার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ভুরস্থট রাজবংশের মর্য্যাদা হানির প্রবল আশঙ্কা।

কাটশাঁকড়ায় ফিরিয়া আসিয়া রাজা রুদ্রনারায়ণ শিবতুল্য গুরুদেবকে যাহা ঘটিয়াছে তাহা খুলিয়া বলিলেন। ঐহিক ও পারত্রিকের পরমবন্ধু হরিদেব রাজাকে ভরসা দিয়া বলিলেন যে জগদম্বার ইচ্ছায় শুভমিলন ঘটিবেই। অসিযুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না।

দীননাথের সহিত দেখা করিয়া সাধকপ্রবর হরিদেব তাঁহার নিকট রাজ-করে কন্যা সম্প্রদানের কথা তুলিলেন। দীননাথ কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া এই সুসংবাদ দিলেন। ভবশঙ্করী আপনার প্রতিজ্ঞার কথা হরিদেবকে বলিলে রাজগুরু একটু হের-ফের করিয়া দিলেন। শক্তি-পরীক্ষা শেষে দাঁড়াইল রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবীর সম্মুখে পশুবলিতে। পাশাপাশি দুইটা মহিষের নীচে একটা মেষ রাখিয়া রাজা খড়্গের এক আঘাতে তাহাদের ছিন্নশির করিবেন। ভবশঙ্করীও অনুরূপ বলিদানে রাজাকে আপনার শক্তির পরিচয় দিবেন। একই সময়ে একই সঙ্গে। বলির পর জগজ্জননীর সম্মুখে কুমারী স্বয়ংবরা হইবেন।

শুভবারে শুভতিথিতে হরিদেব রাজবল্লভী দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিলেন। সমারোহের পূজা। স্বয়ংবরের কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হওয়ায় মন্দিরে নরনারীর অসম্ভব জনতা। শ্বেতাশ্বে চাপিয়া বীরবালা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বলিদানের নির্দ্দিষ্ট সময়েই। করে উন্মুক্ত-

তরবারি, গলায় জবার মালা, পরিধানে রক্তবসন, ললাটে সিন্দুরের *রক্তরাগ, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। 'মা' 'মা' রব ও তুমুল বাদ্যরোলের* মধ্যে রাজা ও ভবশঙ্করীর খড়্গের একটী করিয়া আঘাতে তিনটী করিয়া পশু ছিন্নশির হইল। শক্তি পরীক্ষার পর বীরবালা রাজার প্রশস্ত ললাটে বলির রক্ততিলক দিয়া আপনার গলার মালাটী তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। নির্ব্বাক নরনারী নির্নিমেষ নয়নে এই আশ্চর্য্য স্বয়ংবর দেখিল। দেবীকে প্রণাম করিয়া ভবশঙ্করী অশ্বপৃষ্ঠে পিতৃভবনে ফিরিয়া গেলেন।

বাকী রহিল শুভ-পরিণয়ের মন্ত্রপূত অনুষ্ঠান। তাহাও শীঘ্র ঘটিল। শুভদিনে শুভলগ্নে নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া দীননাথ রাজকরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরস্টুট রাজবংশের আদিপুরুষ নৃসিংহ। এই বংশে দুইজন প্রসিদ্ধ কবি জন্মলাভ করেন—কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র। গড়-ভবানীপুরে রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা চতুরানন নিয়োগী। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁহার জামাতা সদানন্দ—নৃসিংহের বংশধর। সদানন্দের দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমন্ত। পিতার দেহান্তে কৃষ্ণচন্দ্র গড়ভবানীপুরের ও শ্রীমন্ত পেঁড়ুয়াগড়ের রাজ্যলাভ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হইতে রাজা রুদ্রনারায়ণ অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার পিতার নাম রাজা শিব-নারায়ণ। বিদ্যাবুদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্য ও মহানুভবতায় রাজা রুদ্রনারায়ণ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, পিতার মত ভালবাসিত।

বিবাহের পর ভবশঙ্করীর বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইল নবনির্ম্মিত সৌধে। দামোদর তীরে। সাধকাগ্রগণ্য হরিদেবের পদধূলি মাথায় লইয়া নবীনা রাণী গৃহপ্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমাংশ ফলিল।

রাজা রুদ্রনারায়ণ প্রশান্ত মনে রাজধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। একাকী নয়। সহায় হইলেন সুশিক্ষিতা ভবশঙ্করী। বিবাহের সময় রাজা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া নবপত্নীকে বলিয়াছিলেন—"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু"—আমার জীবনের ব্রতে তোমার মন প্রাণ নিবিষ্ট হোক। বিবাহের পর তাহাই হইল। জরা ও যৌবনের অসঙ্গতি মিলন-সঙ্গীতে মিশিয়া গেল।

রাজাকে বলিয়া ভবশঙ্করী রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেন সর্ব্বাগ্রে। কারণ উড়িষ্যায় পাঠান বাংলার মসনদের দিকে চাহিয়া আছে। কখন আক্রমণ করিবে কে বলিতে পারে। সুতরাং সতর্ক হইয়া থাকাই ভাল। ভবশঙ্করী নিয়ম করেন যে, সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে বাধ্য। কেবল যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহারা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা লইয়াই থাকিবেন। নিয়মের সঙ্গে সামরিক শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দেন। সময় পাইলেই তিনি স্বয়ং সৈন্যদের অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। রাজ্যে দুর্গের সংখ্যাও তিনি বাড়াইয়া তোলেন। রাণী আপনার দেহরক্ষার জন্য নারী সৈন্য সংগঠন করিয়া তাহাদের রণকৌশলে সুশিক্ষিতা করেন।

প্রজার সুখেই রাজার সুখ। ভবশঙ্করী রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রজারা কে কেমন আছে, কি তাহাদের অভাব এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার উৎসাহে কৃষি ও শিল্প শ্রীসম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ বস্ত্র বয়ন। প্রজার সমৃদ্ধিতে রাজ্যশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

দুই এক বৎসর পরে রাজা রুদ্রনারায়ণ পুত্রমুখ দেখিতে পান। সন্ন্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া যায়। রাজ্যে আনন্দোৎসব হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই সে উৎসবে নিমন্ত্রিত হন।

যাহারা দীনদুঃখী, অনাথ, আতুর তাহারাও সে আনন্দে যোগ দেয়। মহাসমারোহে শিশু-যুবরাজের নামকরণ হয় প্রতাপনারায়ণ। ইহার কিছুদিন পরে রাজা রুদ্রনারায়ণ অনিত্য সংসার ছাড়িয়া শিবলোকের নিত্যধামে যাত্রা করেন। শোকবিহ্বলা ভবশঙ্করী স্বামীর সহযাত্রী হইতে চান। বাধা দেন কুলগুরু কুলাবধূত হরিদেব। তাঁহার সার-গর্ভ প্রবোধবাক্যে সগু বিধবা মৃত্যুবরণে ক্ষান্ত হন এবং গুরুদেবের অনুমতি লইয়া তিনি কাটশাঁকড়া শিবালয়ে কিছুদিন বাস করিবার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যশাসনের ভার ন্যস্ত হয় সেনাপতি চতুর্ভুর্জ ও দেওয়ান দুর্ল্লভ দত্তের উপর। এই ব্যবস্থা হরিদেবের মনঃপূত না হইলেও রাণীর মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তিনি সম্মতি দেন। তবে শিষ্যাকে সর্ব্বদা সশস্ত্রা ও সাবধান হইয়া থাকিতে আদেশ করেন। কারণ—ভারতের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের কথা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা। শ্রীগুরুর আদেশে সপুত্র রাণী দেহরক্ষিণী স্ত্রী-সেনা লইয়া কাটশাঁকড়ায় নির্জ্জন বাস করিতে লাগিলেন। ব্রতচারিণী হইলেও দেবদত্ত তরবারি তাঁহার সঙ্গে থাকিত। গুরুর আদেশ। রাজবংশের কুলদেবী “জয়দুর্গা”র নিকট “হত্যা” দিয়া রাণী ভবশঙ্করী আশ্চর্য্যভাবে এই দৈব অস্ত্র পান। ইহা নিকটে থাকিলে যত বড় পরাক্রান্ত শত্রু হৌক কেশাগ্রস্পর্শ করিতে পারে না। এমনই ইহার শক্তি।

রুদ্রনারায়ণ পরলোকে। রাজকুমার দুগ্ধপোষ্য শিশু। রাজ্যের রক্ষাকর্ত্রী রাণী ভবশঙ্করী ব্রতচারিণী। তিনি ভবানীপুরে থাকেন না। সেনাপতি ও দেওয়ান এখন রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। এই সুসংবাদ পাইয়া পাঠান সর্দ্দার ওসমানের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। রাজ্য জয়ের এই ত সুবর্ণ সুযোগ! তিনি গোপনে সেনাপতি চতুর্ভুর্জের

নিকট একজন বিশ্বস্ত দূতযোগে প্রস্তাব করেন যে তিনি যদি পাঠানের মিত্রতা করেন তাহা হইলে বাংলা জয়ের পর ভূরস্থট রাজ্য তাঁহারই হইবে। রাজ্যলোভে চতুর্ভুজ হিতাহিত ভুলিয়া গৃহভেদী বিভীষণ হন। তিনি ওসমানকে বলিয়া পাঠান যে কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে রাণী ভবশঙ্করী থাকেন। গভীর রাত্রে মন্দিরে হানা দিলে রাণী ধরা পড়িবেন। রাণী ধরা পড়িলেই তিনি পাঠান পক্ষ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সাবধান, রাণী যেন ঘুণাক্ষরে এই আক্রমণের কথা জানিতে না পারেন। কারণ তিনি জানিতে পারিলে জয়ের আশা দুরাশা।

রাণীকে কাটশাঁকড়ায় পাঠাইয়া রাজগুরু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সেনাপতি ও দেওয়ান বিশ্বাসের পাত্র নয়। তাহারা পাঠানের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। সেইজন্য হরিদেব গুপ্তচর রাখিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। চতুর্ভুজের পরামর্শ অনুসারে পাঠান সন্ন্যাসীর বেশে ভূরস্থট পরগণায় উপস্থিত হয়। আমতার বাজারে একজন গুপ্তচর তাহাদের দেখিতে পাইয়া হরিদেবকে সংবাদ দেয়। তিনিও অবিলম্বে কাটশাঁকড়ায় আসিয়া রাণীকে সতর্ক করেন। গভীর রাত্রে পাঠান মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে নারী-সৈন্য লইয়া রাণী তাহাদের গতিরোধ করেন। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

ইহার পর রাণী রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যভার আপনার হাতে লন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছিল, প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। তাঁহার পুনরাগমনে সকল দুর্দৈবের তিরোভাব ঘটে; শান্তি ও শৃঙ্খলা রাজ্যে ফিরিয়া আসে। প্রজারা বাঁচে। রাণী জানিতেন পাঠান সহজে ছাড়িবে না। সে সদলবলে আবার আসিবে। চতুর্ভুজ বিশ্বাসঘাতক। তাহাকে নামে সেনাপতি রাখিয়া রাণী সামরিক বিধি ব্যবস্থা আপনি করিতে লাগিলেন।

ভবশঙ্করীর অনুমান সত্য। পাঠান দলপতি ওসমান ভুরস্থট রাজ্য-জয়ের আশা ছাড়েন নাই। কারণ এই জয়ের উপর বাংলায় পাঠান আধিপত্যের সুনিশ্চয়তা নির্ভর করে। চতুর্ভুজের সহিত তাঁহার গোপনে পত্রালাপ চলিত। গৃহভেদী বিভীষণ শত্রুকে রাজ্যের অন্ধিসন্ধি জানাইত।

ছাউনাপুর দুর্গের কিছু দূরে বাশুড়ি গ্রামে রাণী ভবানীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুর্গে রাণী যখন যাইতেন তখন মন্দিরে গিয়া দেবীর পূজা করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে লোকজন বড় বেশী থাকিত না। চতুর্ভুজের গোপন পত্রে ওসমান ইহা জানিতে পারেন। রাণীকে জয় করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ সময়। তারপর বাংলার মসনদ অধিকার সহজ ব্যাপার। অধীর চিত্তে পাঠান দলপতি সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সসৈন্যে প্রস্তুত হইয়া। এমন সময়ে তিনি চতুর্ভুজের পত্রে অভিলষিত নিমন্ত্রণ পান। বৈশাখী অমাবস্যার রাত্রে রাণী ভবানীমন্দিরে পূর্ণাভিষিক্তা হইবেন। আক্রমণের এমন সুবিধা ও সুযোগ আর হইবে না। প্রত্যুত্তরে ওসমান লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি ঐদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সদলবলে মন্দিরে উপস্থিত হইবেন। সেনাপতি যেন আপনার কথামত কাজ করেন।

নির্দিষ্ট মহানিশায় পূর্ণাভিষেকের পর সদগুরু হরিদেবের কৃপায় রাণীর যখন চক্রে চক্রে কুলকুণ্ডলিণীর পুলকোচ্ছ্বাস, তখন দ্রুতগামী অশ্বে একজন সৈনিক মন্দিরে উপস্থিত হয়। বাহিরে সশস্ত্রা প্রহরিণীরা বাধা দিতে গিয়া দেখে সে শত্রু নয়, মিত্র। তাহার হাতে দেওয়ানজীর জরুরী পত্র। রাণী যেমন অবস্থায় থাকুন এ পত্র তাঁহার পাওয়া চাইই। ভবশঙ্করী পত্র পড়িয়া দেখিলেন ভীষণ সংবাদ। পাঠান সেনাপতি এই রাত্রেই সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। চতুর্ভুজ তাঁহার

সহায়। মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না। উপায় বাহির করিতেই হইবে। পত্রখানি তিনি গুরুদেবকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন—'মা আজ মহাশক্তি তোমার দেহে আবির্ভূতা। কাহারও সাধ্য নাই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। যুদ্ধ অনিবার্য্য। ছাওনাপুর দুর্গে সংবাদ দাও।' পত্রবাহককে রাণী ছাওনাপুর দুর্গপতির নিকট পাঠাইয়া দিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে সসৈন্যে মন্দিরে আসিতে লিখিয়া দিলেন। পাঠান আসিবার পূর্ব্বে দুর্গাধিপতি ৫০০ পদাতিক, ৫০০ সাদী এবং ১০০ হস্তীপৃষ্ঠে ১০০ জন রণবীর লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 'জয় মা ভবানীর জয়', 'জয় মা রাণী ভবশঙ্করীর জয়' রবে নিশীথের নীরবতা ভাঙিয়া গেল। রণবেশে রাণী সমাগত সৈন্যমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিপদের সংবাদ বিস্তারিত জানাইয়া কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত করিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে বিশাল প্রান্তর। সেখানে সৈন্য সমাবেশ হইল। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাণী স্বয়ং। দুর্ভেদ্য ব্যূহরচনা করিয়া তিনি সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দীপনায় তাহারা নব বল পাইল।

নারীর প্রকৃতি যেন ভৈরবী রাগিনীর ঠাট। কোমল পর্দ্দাই বেশী। কড়ি-মধ্যম দিলেও মন্দ লাগে না। পতি, পুত্র, পরিজন তাহার আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গৃহ তাহার উদারা, মুদারা, তারা। কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে ঠাট দীপকরাগে পরিবর্ত্তিত হয়। তন্বী ধরে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি। মুখে ভ্রূকুটি, করে অস্ত্র। তাহার সে ভীষণ-মধুর রূপ দেখিয়া ঋষি-কবি চণ্ডী রচনা করেন। কত কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস জন্মলাভ করে। যুগে যুগে এমনই করিয়া নানা দিক দিয়া তাহার মহিমা ফুটিয়া উঠে। রাণী ভবশঙ্করীর জীবনে এই সত্য পরিস্ফুট।

যাহাদের জন্য অসময়ে এত আয়োজন তাহারা অনতিবিলম্বে আসিয়া পড়িল। মশাল উঠিল জ্বলিয়া। রাণী বন্দুক ছুড়িয়া অতিথিদের অভ্যর্থনা করিলেন। ওসমান ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন চতুর্ভুজ প্রতারণা করিয়াছে। যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই। তখন হিন্দু-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। মশালের আলোকে মৃত্যু যেন তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। রাণীর অপূর্ব্ব রণকৌশলে ওসমান রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য চিরনিদ্রায় রহিল রণক্ষেত্রে পড়িয়া। পরদিন বিজয়িনী ভবশঙ্করী তাহাদের যথোচিত সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

তাঁহার অপূর্ব্ব পরাক্রম ও পাঠান-বিজয়ের কথা যথাকালে দিল্লীতে পৌঁছায়। সম্রাট আকবর গুণের মর্য্যাদা জানিতেন। তিনি বীরাঙ্গনার সম্বর্দ্ধনার জন্য ভুরস্থটে মানসিংহকে পাঠাইয়া দেন। অম্বরপতি আসিয়া সম্রাটের দেওয়া হীরা জহরৎ ও বীরত্বের পুরস্কার "রায়-বাঘিনী" উপাধি রাণীকে দান করেন।

রাণী ভবশঙ্করীর রণাঙ্গন—"রায় বাঘিনীর পড়া" বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অবস্থিতি তারকেশ্বরের প্রায় ২।৩ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

পুত্র প্রতাপনারায়ণের রাজ্যাভিষেকের পর রাণী ভবশঙ্করী বিষয়-জাল হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রমনে সাধনায় রত হন। কেহ কেহ বলেন তিনি জীবন-সায়াহ্নে কাশীবাসিনী হন এবং এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সাধনোচিত গতি লাভ করেন।

সম্রাটের দেওয়া "রায়বাঘিনী" নামটী আছে এখনও কিন্তু যে বীরত্ব ও গুণগরিমার জন্য ইহার সৃষ্টি তাহা বিস্মৃতির গর্ভে। কন্যা, বধূ, মাতা নারীর তিনটী রূপ। তিনটীতেই ভবশঙ্করী মহিয়সী। তাঁহার কন্যারূপে পিতৃমাতৃকুল, বধূরূপে শ্বশুর-কুল এবং মাতৃরূপে পুত্র ও প্রজাবর্গ ধন্য।

রাণী ভবানী

যুগে যুগে স্বর্গ হইতে কেবল দেবতাই মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন না, দেবীরও আবির্ভাব ঘটে। ছদ্মবেশ বলিয়া সহসা কেহ চিনিতে পারে না কিন্তু পরিচয় ফুটিয়া উঠে কাজে। প্রবাস-বাসের দিন ফুরাইলে তিরোভাবের সন্ধ্যা আসে। তখন আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল পদচিহ্ন থাকে পবিত্র জীবনের ইঙ্গিত ও সঙ্গীত লইয়া। যুগ যুগান্তর তাহা বহিয়া ধন্য হয়।

বাংলার তথা ভারতের চিরগৌরবের পাত্রী রাণী ভবানী সেই দেবী। সেকালের ইংরাজ লেখকের চক্ষেও তিনি নারী-রত্ন। খ্যাতির দিব্যজ্যোতিতে দেদীপ্যমান।

ভবানী আত্মারাম চৌধুরী ও কস্তুরী দেবীর একমাত্র সন্তান, আদরের দুলালী। জন্মভূমি—উত্তর বাংলায় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রাম। জন্মাব্দ ১১৩১ সাল। আত্মারাম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠাবান। উদার চিত্ত ও প্রতুল বিত্তের অধিকারী। গৃহে ৺করুণাময়ী বিগ্রহ—অষ্টধাতুর দশভূজা মূর্ত্তি। দেবসেবা, অতিথিসেবা, পূজার্চ্চনা, শাস্ত্রচর্চ্চা, দুঃস্থের সাহায্য নিত্য কর্ম্ম। যেমন স্বামী তেমনই স্ত্রী। মণিকাঞ্চন সংযোগ।

সেকালে দেবদেবীর নামেই পুত্রকন্যার নামকরণ হইত। ভবানী ভগবতীর বহু-নামের একটী নাম। সংসারে নামের সঙ্গে নামীর বড় একটা সামঞ্জস্য থাকে না। অন্নপূর্ণা অন্নের কাঙালিনী। লক্ষ্মী ভিখারিণী। সাবিত্রীর জ্বালায় স্বামী গৃহত্যাগী। সরস্বতী মুখরা ও প্রখরা। কিন্তু ভবানীর বেলা নাম ও নামীর অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

ভবানীর যুগে স্ত্রীশিক্ষা বলিতে এ যুগে আমরা যাহা বুঝি সে সব কিছু ছিল না। তবে উচ্চবংশের পুরবালারা আপনাপন গৃহে যে কিছু কিছু সংস্কৃত ও বাংলা না শিখিতেন তাহা নয়। ধনীর কন্যা বলিয়া ভবানীর লেখা পড়া সে যুগের তুলনায় মন্দ হয় নাই কিন্তু সহস্রগুণ বেশী হইয়াছিল কি করিয়া নারীর জীবন গড়িতে হয় সে উচ্চ শিক্ষা। তখন গৃহিনীরা জানিতেন হিন্দুর সংসার একটা আশ্রম। তাহার ভিত্তি ধর্ম্মে, প্রতিষ্ঠা সৎকর্ম্মে। আত্মীয়স্বজন দাসদাসী প্রভৃতি বহু লোক সেই পবিত্র আশ্রমে আশ্রমী। কর্ত্তা ও গৃহিণী সকলের পরিচর্য্যায় নিরত। কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, আত্মসুখে লক্ষ্য নাই, রাগদ্বেষ নাই। বালিকা ভবানী দেখিতেন যে দাসদাসী পরিজন থাকিতে কস্তুরী দেবীর না আছে কাজের বিরাম, না আছে বিরক্তি। কোন্ প্রত্যুষে স্নানাহ্নিক সারিয়া সংসারের কাজে নামেন, রাত্রে বিশ্রাম পান সকলের শেষে। কোন অভিযোগ করেন না। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। যেন তিনি এ সংসারের গৃহিণী নন, দাসী। সকলের মনস্তুষ্টি কিসে হয় সেই দিকেই লক্ষ্য। আর সর্ব্বদা লক্ষ্য আত্মারামের কখন কি প্রয়োজন তাহারই আয়োজনের দিকে। শৈশবই শিক্ষার প্রশস্ত কাল। ছোট ছোট কাজকর্ম্মের সঙ্গে কস্তুরী দেবী ভবানীকে শিখাইতেন শিষ্টাচার, গুরুজনে ভক্তিশ্রদ্ধা, ভগবানে বিশ্বাস, ধর্ম্মে নিষ্ঠা, কর্ম্মে প্রীতি, ব্রতকথা। আত্মারাম শিখাইতেন দানধ্যান, দেবপূজা, সর্ব্বজীবে দয়া। মুখের কথায় নয়, কাজে। তিনি কোন প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না। বলিতেন নিঃস্বের বেশে আসেন বিশ্বনাথ। এতো ভিক্ষা নয়, পরীক্ষা। ফিরাইয়া দিব কাহাকে! ভবানীর মনে সে কথা থাকিত গাঁথা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সাধুসন্ন্যাসী, অনাথ আতুরকে যখনই কিছু দিতে হইত, পিতার হইয়া পুত্রীই দিতেন।

ভবানী আট বৎসরে পড়িতেই আত্মারাম পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করেন। সে বয়সে ভবানী 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং' মন্ত্রে ধ্যান করিয়া শিবপূজা করিতে শিখিয়াছেন। 'প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং' এই শিবাষ্টকটী কণ্ঠস্থ। ছোট ছোট বার ব্রতও বাদ যায় না। বিবাহ হিন্দুর একটী প্রধান সংস্কার। তখন বাল্যবিবাহের যুগ। কিন্তু ওই যে মেয়েলী কথায় বলে 'ফুল না ফুট্‌লে বিবাহ হয় না', আর 'যে যার বর সে তার কনে', ভবানীর বিবাহে তাহাই ঘটে। তিনি দশ বৎসর বয়সে নাটোরের রাজা রামজীবনের পোষ্যপুত্র রামকান্তের অঙ্কলক্ষ্মী হন। সীমন্তে সিন্দূর, সর্ব্বাঙ্গে হীরাজহরৎ, দুই হাতে সোণার কঙ্কণ, মাথায় অবগুণ্ঠন, নবোঢ়া ভবানী রাজবধূ। রাজা রামজীবনের ভাগ্য-স্রোতে তখন ভাটার টান। বংশের প্রদীপ একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ রাজপুরী অন্ধকার করিয়া কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণের মত অনুজ রঘুনন্দন পরলোকে। আনন্দ, উৎসাহ, উদ্যম নিভিয়া গিয়াছে। জাগিয়া আছে স্মৃতি। এই বিশাল রাজ্য গড়িয়াছেন দুই সহোদরে। সে তো বেশী দিনের কথা নয়। তাঁহার পিতা কামদেব মৈত্র পুঁটিয়ার রাজসরকারে সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই সূত্রে রামজীবন ও রঘুনন্দন সেখানে চাকরী পান। কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম বাড়ীতেই থাকে। রঘুনন্দনের অসামান্য প্রতিভায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দর্পনারায়ণ ঠাকুর তাঁহাকে ঢাকায় নবাব দরবারে প্রতিনিধি স্বরূপে পাঠাইয়া দেন। তখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসমান বাংলার নবাব-নাজিম। মুর্শিদকুলি খাঁ নবাব-দেওয়ান। রঘুনন্দনের গুণের পরিচয় পাইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে নায়েব-'কাননগু' করেন। ইহাই নাটোর রাজ-বংশের ভিত্তি। কৃতজ্ঞ রঘুনন্দন যোগ্যলোক। সুচারু ভাবে কাজ করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার শুভাদৃষ্ট বলে সম্রাট আওরঙ্গজেব

দাক্ষিণাত্যের শিবির হইতে মুর্শিদকুলি খাঁকে স্মরণ করেন। হেতু—হিসাবপত্র দাখিল। একে আজিম ওসমানের সঙ্গে অসদ্ভাব, তাহাতে আবার হিসাবপত্র কিছুই ঠিক নাই। মুর্শিদকুলি খাঁ কি করিবেন ভাবিয়া কূলকিনারা পান না। কিন্তু সম্রাটের স্মরণ বিস্মরণের বস্তু নয়। হিসাবের কাগজ পত্র কোন রকমে প্রস্তুত হইল কিন্তু মুস্কিল হইল কাননগুকে লইয়া। সে কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজী হয় না। তাহার স্বাক্ষর না থাকিলে কাগজপত্র দাখিল করা অসম্ভব। অন্নদাতার বিপদ দেখিয়া রঘুনন্দন কলে কৌশলে কাননগুর স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া দেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নিশ্চিন্ত মনে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন এবং সম্রাটের শিবির হইতে সসম্মানে ফিরিয়া আসিয়া তিনি রঘুনন্দনকে রায়রায়ান উপাধি দিয়া আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার রাজধানী হয় মুর্শিদাবাদ। রঘুনন্দনের নূতন বন্দোবস্তের ফলে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা বাড়ে। কিন্তু ইহার জন্য অনেক প্রাচীন জমিদারের সর্ব্বনাশ ঘটে। রাজস্ব অনাদায়ে তাহাদের বিষয়সম্পত্তি নবাব বাজেয়াপ্ত করিতে থাকেন এবং দুর্দ্দিনের বন্ধু রঘুনন্দনকে অনেক জমিদারী দান করেন। নাটোর রাজবংশের প্রথম জমিদারী বনগাছী। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি ইহা রঘুনন্দকে উপহার দেন। ইহার পর রাজসাহীর বিশাল জমিদারী রঘুনন্দনের অধিকারে আসে। এমনই করিয়া জমিদারীর পর জমিদারী রঘুনন্দন নবাবের অনুগ্রহে লাভ করেন। প্রতিষ্ঠার আনন্দ আপনার জন্য রাখিয়া রঘুনন্দন রাজ্যপালনের ভার দেন রামজীবনকে। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ রামজীবনকে রাজোপাধি দিয়া রাজ্যপালনের অনুমতি দেন।

ভাগ্যের ভরা-জোয়ারে অর্দ্ধেক বাংলা নাটোর রাজবংশের অধিকারে আসে। নবাবী আমলে জমিদারেরা আপনাপন অধিকারে দণ্ডমুণ্ডের

কর্ত্তা ছিলেন। যথাসময়ে রাজস্ব পাইলেই নবাব সন্তুষ্ট। শাসন সংক্রান্ত কোন কিছুতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজা রামজীবন যথাসময়ে রাজস্ব দিতেন ও যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতেন। এইজন্য নবাব দরবারে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল।

জোয়ারের পর ভাটা। কালিকাপ্রসাদের মৃত্যুর পর রাজা রাম-জীবন রামকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; কারণ রঘুনন্দনের সন্তান ছিল না; কনিষ্ঠ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ ছিল কিন্তু মনোমালিন্য অন্তরায়।

গুণে লক্ষ্মী রূপে সরস্বতী ভবানীকে পাইয়া রাজা রামজীবনের নিরানন্দ ভাব অনেকটা কাটিয়া যায়। তিনি পুত্রবধূকে কন্যার মত স্নেহ করিতেন; ভবানীও তাঁহাকে ঠিক আপনার পিতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবাযত্ন করিতেন। পরিতুষ্ট রাজা ভবানীকে বলিতেন. 'মা, আশীর্ব্বাদ করি তুমি 'শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী' হও। তাঁহার এই আশীর্ব্বাণী যে নিষ্ফল হয় নাই একথা লেখা বাহুল্য। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রামজীবনের লোকান্তর ঘটে। মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া রাজা সেবারতা ভবানীকে বলিয়াছিলেন, "মা, যাবার সময় হয়েছে। আমি তো যাচ্ছি। রামকান্ত রৈল, রাজ্য রৈল, তুমি রৈলে। সব দেখো।" কাঁদিতে কাঁদিতে ভবানী বলিয়াছিলেন "আমি পার্ব্বো কেন, বাবা"। তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া রাজা বলিয়াছিলেন "পার্ব্বে বৈ কি, মা। তুমি যে আমার মা ভবানী। আর দেখ, দয়ারামকে কখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না। তার কথা মত তোমরা চোলো"। তিনি চিরবিশ্বস্ত দয়ারামকে ডাকিয়া যাহা বলিবার বলিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দেন। ইহার পর ইষ্টদেবীর নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার অজপা ফুরায়।

ধনৈশ্বর্য্য, রাজ্যসম্পদ জন্মান্তরের তপস্যার ফল। যথাকালে নাটোরের রাজা হইলেন রামকান্ত, রাণী হইলেন ভবানী। দেওয়ান রহিলেন দয়ারাম—দিঘাপতিয়া রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তা। রাজার বয়স আঠারো; রাণী "পঞ্চদশ বসন্তের এক গাছি মালা"। রূপকথার 'এক যে ছিল রাজা তার ছিল এক রাণী' নয়। অর্দ্ধেক বাংলার রাজারাণা। দুষ্টের দমন আছে; শিষ্টের পালন আছে: রাজস্বের আদায় অনাদায় আছে; প্রজারঞ্জন আছে; নবাবের রাজস্ব আছে; চক্রান্তের ভয় আছে। ভরসা ভগবান; নিমিত্ত—দয়ারাম ও সদাশয় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। বুদ্ধি কর্ম্মের অধীন। দয়ারামের মন্ত্রণা মত রামকান্ত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং ইহাতে তাঁহার দক্ষতা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

ভবানী রহিলেন অন্তঃপুর লইয়া। স্থির বুদ্ধি, ধীর বিবেচনা, বিনম্র স্বভাব, মিষ্ট কথা, শিষ্ট ব্যবহার। আত্মীয়স্বজন দাসদাসী সকলের মুখে তাঁহার সুখ্যাতি ধরে না। ত্যাগই যে প্রকৃত ভোগ ভবানীর শৈশবের এই সুশিক্ষা রাজৈশ্বর্য্যের আবিল আবর্ত্তে তলাইয়া যায় নাই; বরং সুযোগ পাইয়া তাঁহার দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি, ধর্ম্মকর্ম্মে অচলা মতি, সত্যে পরম নিষ্ঠা, আশ্রিতপালনে একান্ত আগ্রহ নারীত্বের অনাগত পূর্ণতাকে জয়শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সাবিত্রী, সীতা, বেহুলার যে দেশে জন্ম, যে-দেশে খণ্ড খণ্ড সতী-দেহে বাহান্ন পুণ্যপীঠের সৃষ্টি, ভবানী সেই দেশের কন্যা। চলিতেন স্বামীর ছন্দে, কায় মন ও বাক্যে। স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান,। স্বামীর সেবায় তন্ময়।

রামকান্ত ও ভবানীর রাজ্যাভিষেকের দিন হইতে দেবীপ্রসাদের প্রাণে তিলমাত্র শান্তি ছিল না। সে রাজা রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

রক্তের দিক হইতে নাটোরের সিংহাসন তাহারই। কিন্তু উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে পোষ্যপুত্র রামকান্ত! গৃহবিবাদ বাধাইতে তৃতীয় ব্যক্তি এদেশে যত সুলভ অন্যত্রে তত নয়। এই গৃহবিবাদে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে কিন্তু কাহারও চৈতন্য হয় নাই। মহারাজা নন্দকুমার প্রভৃতি বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেবীপ্রসাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া রামকান্তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ বাঁচিয়া। রামকান্ত যেন পর্ব্বতের আড়ালে। তবে নবাব জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রথের অপেক্ষা করিতেছেন। রাজনৈতিক আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। কখন কি ঘটে কে বলিতে পারে। এই ভরসায় দেবীপ্রসাদ ও তাহার পরমবন্ধুর দল চক্রান্তের হাল ছাড়িল না। রামকান্ত ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। এদিকে কালের কুটিল গতিতে মুর্শিদকুলিখাঁর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসিলেন আলিবর্দ্দী খাঁ। নূতন নবাব। কে রামকান্ত, কি তাহার বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না। চক্রান্তকারীরা দলপুষ্ট। তাহাদের প্ররোচনায় আলিবর্দ্দী রামকান্তের রাজ্যচ্যুতি ও দেবীপ্রসাদের রাজ্যলাভের আদেশ দিলেন। দেবীপ্রসাদ সৈন্যসামন্ত লইয়া মহানন্দে নাটোরের সিংহাসন অধিকার করিল। প্রাণ বাঁচাইতে রাজা রামকান্ত ভবানীকে লইয়া গুপ্তপথে পলায়ন করিলেন। রাজত্বের ভিতর নিরাপদ আশ্রয় নাই। বিপন্ন রাজদম্পতী জগৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন। নিরাশ্রয়কে জগদীশ্বর রক্ষা করেন। জগৎশেঠ দুইজনকে সসম্মানে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কেহ কেহ বলেন এই রাজ্যচ্যুতি রাজা রামকান্তের "স্বখাতসলিল"। অর্থাৎ অপরাধী তিনিই। হেতু—উদ্দাম যৌবন, রাজশক্তির উগ্র উন্মাদনা এবং সুসময়ের বন্ধুজনের চাটুপুষ্পাঞ্জলি। চিরহিতৈষী দয়ারামের

হিতাকাঙ্ক্ষা, সাধ্বী ভবানীর অনুনয়-বিনয় এই দুর্গতির গতিরোধ করিতে পারে নাই।

কিন্তু হেতু যাহাই হৌক, সহসা দুর্জ্জয় বেগে অহিত আসিয়া রাজদম্পতীর দুর্দ্দশার বাকী রাখিল না। যেন ঈশানের প্রলয়নৃত্যে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। যিনি লোককে আশ্রয় দিতেন তিনি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পরাশ্রিত। অজ্ঞাতবাসের আশঙ্কা, উদ্বেগ, দুঃখ নিত্যসঙ্গী। রামকান্তের বেদনা বুঝিতেন ভবানী। সর্ব্বহারা স্বামীর নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া যাহাতে এই অনভ্যস্ত দৈন্যদশার দারুণ কষ্টের লাঘব হয় মনপ্রাণ দিয়া তাহাই করিতেন। তরুণী স্ত্রীর এই কল্যাণী মূর্ত্তি রাজৈশ্বর্য্যে যেন প্রচ্ছন্ন ছিল। দুর্দ্দিনে দেখিতে পাইয়া রামকান্ত বুঝিলেন অকল্যাণের ভিতর কল্যাণও থাকে। ভবানীর ঐকান্তিক সেবাযত্ন, দরদভরা সান্ত্বনা ও গভীর ভালবাসার মর্ম্ম তিনি এতদিন বুঝিয়াও বুঝেন নাই। এখন বুঝিতে পারিয়া দুঃখ ও আনন্দ দুইই হইল। তাঁহার সকলই গিয়াছে কিন্তু ভবানী আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডারে এ রত্ন দুর্লভ। বাহিরে তিনি সর্ব্বস্বান্ত কিন্তু পতিপ্রাণা ভবানীর হৃদয়ের স্বর্গরাজ্য যে তাঁহারই। সে ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয় এমন সাধ্য নবাব আলীবর্দ্দী তো দূরের কথা, দিল্লীশ্বরেরও নাই।

অজ্ঞাতবাসের এই নিদারুণ দুঃসময়ে রাজকন্যা তারা জন্মলাভ করেন। দুঃখে, কষ্টে, অনিয়মে ভবানীর দেহ কিছুদিন হইতে ভাল ছিল না কিন্তু তিনি স্বামীকে এ কথা জানিতে দিতেন না। এইবার তাঁহার দেহ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বিপন্ন রামকান্ত চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল নয়। দুইটী পুত্র সন্তান হইয়া বাঁচে নাই। কন্যা আসিয়া একি বিপদ ঘটাইল! স্বামীর দুর্ভাবনা ও মনোকষ্ট দেখিয়া ভবানী গোপনে কাঁদিতেন আর ভগবানকে ডাকিতেন।

সতীর কাতর প্রার্থনা ভগবানকে মর্ত্ত্যে টানিয়া আনে, এমনই অমোঘ শক্তি। ভবানীর দুঃখের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। একদিন দয়ারাম আসিয়া সংবাদ দিলেন যে দেবীপ্রসাদের রাজ্যাভিনয়ের যবনিকা পড়িল বলিয়া। যোগাড় যন্ত্র সব ঠিক কিন্তু টাকা চাই। আমীর ওমরাহদের নজর দিতে হইবে। টাকার পরিমাণ শুনিয়া রামকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'দয়াদাদা, রাজ্যলাভের আশা দুরাশা। আমার কি আছে যে অত টাকার যোগাড় কর্ব্ব।' অন্তরালে থাকিয়া ভবানী সমস্তই শুনিতেছিলেন। তিনি দাসীর হাত দিয়া গহনার বাক্সটী দয়ারামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দয়ারামের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বলিলেন—"অপরাধ নিয়ো না মা। নিরুপায় হোয়েই আমাকে নিতে হচ্ছে। যা নিচ্ছি তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমার দুঃখ যাবে।" ভবানী বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার শাখা সিঁদুর থাকিলেই হইল, অন্য গহনার প্রয়োজন নাই। স্বামীর যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাই যেন তিনি করেন।

অর্থবল ও দয়ারামের বুদ্ধিবলে নবাব আলিবর্দ্দী দেবীপ্রসাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার রাজ্যচ্যুতির আদেশ দিলেন। সময় বুঝিয়া দয়ারাম রামকান্তের রাজ্যলাভ মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। রাজদম্পতি সসম্মানে নাটোরে ফিরিয়া আসিলেন। দেবীপ্রসাদের উপর কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়ে রাজসাহী রাজ্যের নরনারী আনন্দোৎ-সবে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু রাজা রামকান্তের পুনরায় রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এক বিষম বিভীষিকা দেখা দিল—"বর্গী এল দেশে।" অশ্বারোহী মারাঠা সেনা পঙ্গপালের মত দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যেখানে "হর হর মহাদেও" রব সেখানেই লুঠতরাজ, হত্যা।

তাহাদের প্রলয়নৃত্যে সোণার বাংলা কাঁপিতে লাগিল। নবাব আলিবর্দ্দীর বাধা স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। বর্গীরা একদিন রাজধানী মুর্শিদাবাদ লুঠ করিল। গঙ্গার পশ্চিমতীর তাহাদের অত্যাচারের কেন্দ্র। প্রাণভয়ে লোক পৈতৃক ভিটার মায়া ছাড়িয়া দলে দলে রাজা রামকান্তের রাজ্যে পলাইতে লাগিল। সকলেরই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, থাকিবার গৃহ চাই। উৎপীড়িত শরণাগতের জন্য রাণী ভবানীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বলিলেন—মাভৈঃ। রাজদম্পতীর উৎসারিত করুণায় বিপন্নেরা বাঁচিল কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ভারে রাজভাণ্ডার দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। রাজধর্ম্ম বলিল—'জয়োঽস্তু।'

এই সময় হইতেই রাণী ভবানীর জয়যাত্রার প্রারম্ভ। লোকের মুখে মুখে তাঁহার বহুবিধ পুণ্য অনুষ্ঠান, করুণার কথা, দানের কাহিনী দেশ দেশান্তরে ছড়াইতে থাকে।

কিন্তু ভাগ্যদেবী রাণীর ভাগ্যে সংসারসুখ লেখেন নাই। বর্গীর হাঙ্গামায় বিব্রত রাজা রামকান্ত ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সহসা এ জগৎ ছাড়িয়া যেখানে শত্রু নাই মিত্র আছে, শোক নাই আনন্দ আছে, মৃত্যু নাই অমৃত আছে সেই দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। রাজ্য রহিল পড়িয়া। কাঁদিতে রহিলেন ভবানী আর রাজকন্যা তারা। ৩২ বৎসর বয়সে রাণী ভবানীর সীমন্তিনী নাম গেল জন্মের মত ঘুচিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সুখ গেল, শান্তি গেল, সাধ গেল, আহ্লাদ গেল। গেল না কেবল প্রাণ। রাজ্য আছে, রাজ্যেশ্বর নাই, মন্দির আছে বিগ্রহ নাই; ছায়া আছে কায়া নাই। হিন্দু বিধবার এই "নাই" যে কি মর্ম্মান্তিক, সন্ন্যাস-ব্রত-চারিণী তাহাকে না দেখিলে বোঝা যায় না।

সংসারের আনন্দ কোলাহল তাঁহাকে অবসর দিল। দিল না কর্ম্মসূত্র। সে তাঁহাকে রাজসাহীর মত বিশাল রাজ্যের অধিশ্বরী

করিল। বিপ্লবের যুগ। বিপদের আশঙ্কা পদে পদে। তথাপি নবাব আলিবৰ্দ্দী তাঁহাকেই রাজসাহীর রাজ্যভার দিলেন। অবলার উপরে ন্যস্ত হইল অসংখ্য প্রজার জীবন মরণ। শ্বশুরবংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে রাণী ভবানী ভগবানের নাম লইয়া এই গুরুভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। সন্তানের মধ্যে কন্যা তারাদেবী। দুইটী পুত্র ভগবান দিয়া ফিরাইয়া লইয়াছেন। রাণীর বুভুক্ষু মাতৃত্ব অসংখ্য সন্তানকে কোলে টানিয়া লইল। মাতৃরাজ্যে প্রজাবর্গের সুখ শান্তির সীমা পরিসীমা রহিল না। শাসনপ্রণালীর নৈপুণ্যে তাঁহার রাজ্যের বাৎসরিক আয় দাঁড়াইল দেড় কোটী টাকা। নবাবকে রাজকর দিতে হইত ৭০ লক্ষ টাকা।

রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই মহীয়সী নারী সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কোথাও প্রশস্ত রাজপথ, কোথাও বিশাল জলাশয়, কোথাও বৃহৎ দেবালয়, কোথাও বিরাট অতিথিশালা, কোথাও বিদ্যাপীঠ তাঁহার জয়ধ্বজা উড়াইতে লাগিল। নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁ রাণী ভবানীর সুশাসন ও কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে রাজবালা তারাদেবী গৌরীদানের উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীমাতার একমাত্র কন্যার আসন্ন বিবাহে রাজ্যে আনন্দের চাঞ্চল্য দেখা দিল। বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ আসিলেন যোটক বিচার করিতে। নস্যাধার ও পুঁথিপত্র লইয়া আসিলেন কত নৈয়ায়িক, স্মৃতিশিরোমণি, তর্কচূড়ামণি। বিবাহের বিরাট ফৰ্দ্দ করিতে বসিলেন প্রবীণ দয়ারাম। দেশে দেশে লোক ছুটিল বাবুই পাখীর বাসা সংগ্রহ করিতে। সেকালে রাজা রাজড়ার বিবাহে এত সমারোহ হইত যে অশ্বারোহী প্রহরী না রাখিলে শান্তিরক্ষা দুরূহ হইত। বুরুসের প্রচলন ছিল না। সেইজন্য অশ্বদেহ পরিষ্কারের জন্য বাবুই পাখীর

বাসার প্রয়োজন হইত। আর একটী প্রথা ছিল বিবাহসভায় আবির ছড়াইয়া তাহার উপর বসিবার আসন বিছানো। বহু স্বর্ণকার গহনার নূতন নূতন নমুনা লইয়া রাজবাটীতে আসিতে লাগিল। তাঁতিরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাপড় বুনিতে লাগিল—বিবাহে অনেক কাপড় লাগিবে। দাসদাসীরা আপনার লোক যে যেখানে ছিল লইয়া আসিল। রুদ্রানন্দ চক্রবর্ত্তী রাণী ভবানীর দীক্ষাগুরু। তিনি সপরিবারে আসিলেন। পুরোহিত গৃহিনী সোণার গহনা ও গরদের সাড়ী পাইবার দিন গণিতে লাগিলেন। ইতর ভদ্র সকলেই উৎফুল্ল। অবশেষে এত প্রতীক্ষার বিবাহোৎসব একদিন আসিয়া পড়িল। খাজুরা গ্রামের রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে রূপবতী তারাদেবী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইলেন।

রাণী ভবানী ভাবিয়াছিলেন কন্যাজামাতার হাতে রাজ্যভার দিয়া আপনি অবসর গ্রহণ করিবেন। নবাব সেরেস্তায় তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে বিবাহের অল্প দিন পরেই তারা বিধবা হওয়ায় ভবানীকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। তিনি ছাড়িব মনে করিলে কি হয়, বিষয় তাঁহাকে ছাড়িল না। বাঁধিতেও পারিল না। তাঁহার বৈরাগী মন পূজার্চ্চনা ও লোকসেবা ব্রতে নিমগ্ন হইল। মাতার দেখাদেখি তারাও ভগবানের চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন।

তারার বৈধব্যের পর রাণী ভবানী অধিকাংশ সময় বড়নগরে বাস করিয়া গঙ্গাস্নান, দেবদেবী দর্শন, পূজার্চ্চনাতেই সময় কাটাইতেন। এখানে তিনি বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার মধ্যে শিবমন্দির ১০৮। ইহার মধ্যে ২৮টী তিনি তাঁহার গুরুদেবকে দান করেন। ছাতিম গ্রাম হইতে ৺করুণাময়ীর বিগ্রহ মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া বড়নগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত দেবালয়ে দেবসেবা যাহাতে সুচারু ভাবে চলে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের একটী অনুষ্ঠানও বাদ দিতেন না। আপনার রাজ্যে যাহাতে প্রজার ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকে সে দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ও কঠোর ব্যবস্থা ছিল।

সাধু, মোহান্ত, ক্ষেত্রবাসী, মঠধারী, যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সংসার ত্যাগীর দল তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা নগদবৃত্তি পাইত। অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বাৎসরিক বৃত্তি পাইতেন ২৫ হাজার টাকা। ইহাতে তাঁহারা টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি খুলিয়া শিক্ষার্থীকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন।

সেকালে হাঁসপাতালের নামগন্ধ কেহ জানিত না। দাতব্য চিকিৎসালয়ও ছিল না। রোগে বৈদ্যই ছিল ভরসা। রাণী ভবানীর বেতনভোগী ৮জন বৈদ্য ছিল। ইহারা ঔষধ, পথ্য ও রোগীর সেবা করিবার লোক লইয়া গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। রোগীকে না দিতে হইত বৈদ্যের দর্শনী, না লাগিত ঔষধ ও পথ্যের মূল্য।

ভবানীর দানের সীমা ছিল না। তিনি বলিতেন যে ধন দুঃস্থের প্রয়োজনে লাগে না তাহা ধনই নয়। যক্ষপুরীতে ধনের অভাব নাই কিন্তু সে ধন থাকা না থাকা সমান। সময় অভাবে সকল প্রার্থীকে আপনার হাতে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন না বলিয়া কর্ম্মচারীদের উপর আদেশ ছিল যে তাঁহার বিনা-অনুমতিতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা দান করেন; কেহ যেন রিক্ত হাতে না ফিরে। পোদ্দারের এক টাকা, খাজাঞ্চির ৫ টাকা, মুৎসুদ্দির ১০ টাকা ও দেওয়ানের ১০০ টাকা ইহাই ছিল কর্ম্মচারীদের দানের অধিকার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনি দুই হাজার কুমারী ও সধবাকে একখানি করিয়া পাটের সাড়ী, এক জোড়া শাঁখা ও একটী করিয়া সোণার নথ দিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বিদায় পাইতেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

দীন দুঃখী তাঁহার দয়ায় নূতন কাপড় পরিয়া, পূজার তিন দিন পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া বাঁচিত। ভূসম্পত্তি দানেও রাণী ভবানী অদ্বিতীয়া। প্রায় ৫ লক্ষ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়া তিনি বহু অভাবগ্রস্তের পুরুষানুক্রমিক জীবননির্ব্বাহের পথ সুগম করিয়া দেন।

কাশীধামে দুর্গাবাড়ী, বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, গোপালবাড়ী প্রভৃতি বহু দেবালয় এখনও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার জয় গান করে। তাঁহারই দেওয়া ৩০০ বাটীতে বহুলোক তীর্থবাসী। তাঁহার অন্নসত্র নিরন্নের ভরসা।

কাশীর সীমানা জুড়িয়া তাঁহার দানশীলতার আসন পাতা। কোথাও জলাশয়, কোথাও কূপ, কোথাও ছায়াসুশীতল বিশ্রামের স্থান। পথচারী সেখানে তৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূর করে। তিনি যখন কাশীতে থাকিতেন অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য ২৫ মণ চাল বিলাইতেন। আপনার বাটীতে ৮ মণ ছোলা ভিজানো থাকিত অনাহুতের জন্য। ১০৮ জন কুমারী, দণ্ডী ও সধবাকে প্রত্যহ পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন ও এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতেন। জীবজন্তুও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হইত না। কাশীর লোকে তাঁহাকে বলিত দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা।

গয়াধামেও তাঁহার কীর্ত্তির অভাব নাই। তাঁহার পুণ্য অনুষ্ঠান ও দানের কথা লিখিয়া শেষ হয় না। একবার কি কারণে টাকার টানাটানি পড়ে। তিনি গোলাবাড়ীর শস্য বেচিয়া তিন লক্ষ টাকা পান কিন্তু প্রার্থীর অভাব মিটাইতে না পারায় আপনার বহুমূল্য গহনায় বাকী টাকা সংগ্রহ করেন ও যাহাকে যাহা দিবার তাহা দেন।

নারী বিশ্বজননী। স্নেহ, মমতা, ক্ষমাই তাহার ভূষণ। সে অপকারীরও উপকার করে। গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানের সময় টিকারীর রাজা ভবানীকে বাধা দেয় ও ৫ লক্ষ টাকা না দিলে তিনি

পিণ্ড দিতে পাইবেন না এই অন্যায় আবদার করে। এই ধর্ম্মকার্য্যে বিঘ্নের কথা রাণী ভবানী নবাব আলিবর্দ্দীকে জানান। নবাব সংবাদ পাইয়াই মুঙ্গেরের সুবাদারকে ইহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। সুবাদার সসৈন্যে টিকারী রাজ্যে উপস্থিত হয়। এই অকারণ রণসজ্জার কারণ বুঝিতে পারিয়া টিকারীরাজ রাণী ভবানীর শরণ লয়। বলে—'অপরাধ হইয়াছে। মার্জ্জনা করুন। আপনি স্বচ্ছন্দে পিণ্ড দিন। টাকা কড়ি কিছু লাগিবে না। আমাকে বাঁচান।' সুতরাং মুঙ্গেরের সুবাদার মুঙ্গেরে ফিরিয়া যান। প্রণামী বলিয়া তিন লক্ষ টাকা টিকারীর রাজাকে দিয়া রাণী ভবানী গয়াকৃত্য শেষ করেন। ইহার কিছুদিন পরে নবাবের রাজস্ব দিতে না পারায় টিকারীরাজ কারারুদ্ধ হয়। রাজস্বের প্রতিভূ হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন রাণী ভবানী।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের উচ্ছেদসাধনের চক্রান্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মীরজাফর প্রভৃতি সকলেই ছিলেন। ছিলেন না রাণী ভবানী। অথচ এক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র সিরাজ তাঁহার বিষম উদ্বেগের কারণ হইয়াছিলেন। তারা দেবীকে লইয়া ভবানী তখন বড়নগরের রাজবাটীতে। রাজবাটী গঙ্গার সন্নিকট। ছাদে দাঁড়াইলে দেখা যায়। একদিন তারা ছাদে চুল শুকাইতেছেন এমন সময় সিরাজের বজরা গঙ্গাবক্ষে উপস্থিত। বজরা হইতে তারার অপরূপ রূপলাবণ্য চকিতের মত দেখিতে পাইয়া সিরাজের চিত্ত-বিকার ঘটে। তিনি তারাকে বেগম করিবার জন্য লালায়িত হন। হিন্দুদের যে বিধবাবিবাহ নাই সে কথা নবাব জানিতেন না। অনেক হিন্দুনারী মোগলের বেগম। সুতরাং সিরাজ ভবানীকে তাঁহার মনের কথা পত্রযোগে জানান। সে পত্রের দুর্দ্দশার কথা না লেখাই ভাল। সিরাজের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। কেহ বলেন

বড়নগরের গঙ্গার পরপারে মস্তরাম বাবাজী নামে একজন সিদ্ধপুরুষ থাকিতেন। তাঁহারই অলৌকিক ক্ষমতায় নবাব ব্যর্থমনোরথ হন। কেহ বলেন সিরাজকে নিরস্ত করিতে গঙ্গাতীরে এক চিতা জ্বালাইয়া রাণীর লোকজন রটায় যে হঠাৎ রাজকন্যা তারার মৃত্যু হইয়াছে। রটনাকে সত্য ঘটনা মনে করিয়া সিরাজ ক্ষান্ত হন।

ভবানীকে দলে আনিবার চেষ্টায় চক্রান্তকারীরা এই কথার উল্লেখ করিলে এই মহীয়সী নারী বলিয়াছিলেন—'ভুল ভ্রান্তি সকলেরই হয়। আপনারা যাহা করিতে উদ্যত তাহাই যে অভ্রান্ত তাহা কে বলিতে পারে! সিরাজের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করুন—আমি যোগ দিব কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া আমি ভাল মনে করি না।' কিন্তু নারীর কথা কে শোনে। ২৩শে জুন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-প্রান্তরে প্রভাতেই ঘটে মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত সূর্য্যাস্ত ও ইংরাজ রাজত্বের অরুণোদয়। বিধি-লিপি।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিণাম অরাজকতা। দস্যুতস্করের উপদ্রবে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। চারিদিকে অশান্তি। রাণী ভবানীর কথা কেন শুনি নাই বলিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় তখন সাধ্যের বাহিরে। যাহা হৌক, এই ঘোর অশান্তির দুর্দ্দিনে ভবানীর অশ্রান্ত চেষ্টা ও অভ্রান্ত শাসন নৈপুণ্যে রাজসাহী রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নাই। ইহা কম শ্লাঘার কথা নয়।

অরাজকতার জের মিটিতে না মিটিতে আসে ১১৭৬ সালের ভীষণ "মন্বন্তর"। একে অনাবৃষ্টির দৌরাত্ম্যে মাঠে ফসল ফলে নাই। তাহাতে রাজস্বসংগ্রাহক মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। না দিলেই বিপদ। বাংলায় হাহাকার পড়িয়া গেল। খাইতে না পাইয়া দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। বসন্ত, ওলাউঠা, জ্বর

সময় পাইল। এখানে ওখানে সেখানে মৃতদেহ। দাহ করিবার লোক নাই। শৃগাল, কুকুর, শকুনি খাইয়া শেষ করিতে পারে না। গলিত শবের দুর্গন্ধে দিগদিগন্ত ভরিয়া উঠিল। শস্যশ্যামলা বাংলা শ্মশানে পরিণত হইল।

দেশের এই চরম শঙ্কটে করুণাময়ী ভবানী স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোটী কোটী সন্তানের সেবা করিতে তিনি দিলেন রাজভাণ্ডার খুলিয়া। কিন্তু ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়াও তিনি দেশজননীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস দূর করিতে পারিলেন না। করাল দুর্ভিক্ষ ঘুচিল না। নিবিড় বেদনায় নিরুপায় দীনপালিনী ভবানীর অন্তর কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। এই বেদনার উপর লাগিল শ্বশুরবংশের মানসম্ভ্রমে আঘাত। যে বিশাল রাজ্যের স্রষ্টা রঘুনন্দন এবং বিষ্ণু রাজা রামজীবন, যে রাজ্যের সর্ব্বেশ্বরী ভবানী প্রজার কল্যাণে সর্ব্বদা অবহিত, কোম্পানীর নববিধানে সে রাজ্যে তাঁহার ক্ষমতার অপমৃত্যু ঘটিল। নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে রাজ্যেশ্বরী হইলেন রাজসাহীর একজন ইজারাদার। ইহার পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস নাটোর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বাহারবন্দ জমিদারী কাড়িয়া লইয়া প্রিয় ভৃত্য কাশীমবাজারের কান্তবাবুকে দান করিয়াছিলেন।

ভবানী বুঝিলেন ভগবানের ইচ্ছা নয় যে তিনি আর ধনে জনে জড়াইয়া থাকেন। অতুল বিভবের মধ্যে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসিনী—অশনে, বসনে ও মনে। ধনসম্পদের অহঙ্কার ও আসক্তি তাঁহার ছিল না। কি করিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, প্রজারা সুখে থাকে, দীনদুঃখীর অভাব দূর হয় তিনি অহরহ সেই চিন্তা ও কাজ করিতেন। ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণকে বিষয়াশয় বুঝাইয়া দিয়া বড়-নগরে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার নাটোর পরিত্যাগের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও নিরুদ্দিষ্টা হইলেন।

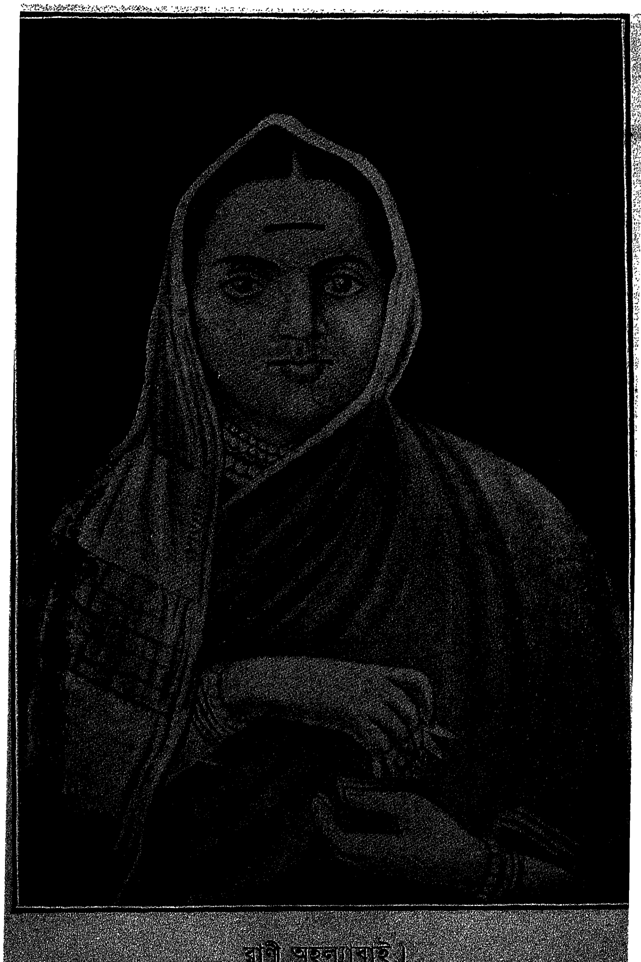
বড়নগরে দিবানিশি জপতপে মগ্ন থাকিয়া রাণী ভবানী ১২১০ সালে ৭৯ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। বাংলার নরনারী অশ্রুজলে বিশ্ববিশ্রুতা জননীকে কালস্রোতে বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু সে বিসর্জ্জন নয়, প্রতিষ্ঠা।

"তোমার শোকের সিন্ধুসরিৎ মধুক্ষরা আজ্‌কে হোক্।
মধুক্ষরণ করি পাবন দীর্ঘশ্বাসের পবন বোক্॥
ধরার ধূলি অঙ্গে উঠে হোক মধুময় অঙ্গ রাগ।
তৃণৌষধি ক্ষরুক মধু মধুতে হোক পুষ্ট যাগ॥
কবির ছন্দে ঝরুক মধু ক্ষরুক মধু যজ্ঞ-ধূম।
মধু ক্ষরণ করুক গগন পুষ্পিত হোক মধু-দ্রুম॥
আদিত্য সোম মধুদ্যুতি, বিলাক মধু বিশ্বময়।
ওঁ মধু, ওঁ মধুজীবন, শান্তি! শান্তি! স্বস্তি! জয়!!"

মহতের মহাপ্রয়াণে এ-কালের কবির এই শাশ্বত বাণী রাণী ভবানীর সম্বন্ধেও খাটে।

সে-যুগে এ-যুগে অনেক প্রভেদ। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য রাণী ভবানীর জীবনে শতদলের মত বিকশিত হইয়াছিল, যে মাতৃস্নেহের সুমধুর অমৃত ধারায় তিনি অসংখ্য সন্তানকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাই যে ভারতনারীর সার্থকতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ধন, জন ও জীবন পরার্থে উৎসর্গ করিয়া এই সর্ব্বত্যাগিনী রাজরাণী কর্ম্মশেষে বহুদিন হইল লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন কিন্তু যতদিন বাংলার অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বাঙালী আপনাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিবে ততদিন এই মহিমময়ী নারীর পুণ্যস্মৃতি স্নিগ্ধ কিরণে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বরেণ্য হইয়া থাকিবে।



রাণী অহল্যাবাই।

অহল্যা বাই

রাণী ভবানীর কর্ম্মক্লান্ত জীবন যখন অস্তাচলের পথে তখন কীর্ত্তির উদয়াচলে আর একজন ভারতনারীর আগমনী বাজিয়া উঠে। এই নব উদয়নের নায়িকা অহল্যা বাই - অখ্যাত কৃষিজীবীর কন্যা; বিখ্যাত হোলকার বংশের বধূ; মালব দেশের রাণী। চরিত্রে দেবী, প্রতিভায় অনন্যসাধারণ, লোকহিতব্রতে চিরস্মরণীয়া।

কৃশাঙ্গী অহল্যার জন্ম ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতার নাম আনন্দরাও সিন্ধ। রূপগৌরব অহল্যার ছিল না কিন্তু তাঁহার মুখে এমন একটি দিব্য জ্যোতি খেলা করিত যে দেখিলেই সম্ভ্রমে মাথা নত হইত। হোলকার বংশ জাতিতে শূদ্র। "হল" গ্রাম হইতে হোলকার উপাধির উৎপত্তি। এই গ্রাম পুণা নগর হইতে ৪৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে নীরা নদীর তীরে। বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও উপাধির স্রষ্টা মলহর রাওয়ের জন্মভূমি।

মলহর রাও ছিলেন কর্ম্মবীর। বাল্যে মেষ পালক, যৌবনে যোদ্ধা; যোদ্ধা হইতে সেনাপতি; সেনাপতি হইতে মালব প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। ইহাই তাঁহার ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অহল্যা মলহর রাওয়ের পুত্রবধূ। তাঁহার একমাত্র পুত্র খণ্ডে রাওয়ের বণিতা। মালিরাও ও মুক্তা বাইয়ের জননী।

মলহর রাওয়ের জীবনের শেষ অধ্যায়টী বড় বিষাদ-করুণ। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। দুরদৃষ্টের গ্লানি তাঁহাকে অবসন্ন করে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে খণ্ডে রাও ভীলদস্যু দমন করিতে গিয়া নিহত হন। উঠিতে বসিতে অশ্রুমুখী পুত্রবধূর বিধবা বেশ, পিতৃহীন

পৌত্র পৌত্রীর মলিন মুখ মলহর রাওয়ের পুত্রশোকের চিতা নিভিতে দিত না। অবশেষে ভগবান তাঁহাকে সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে চরণপ্রান্তে টানিয়া লন।

তাঁহার স্বর্গলাভের পর মালীরাও মালবের অধিপতি হয়। কিন্তু নামে। সে ক্ষীণবুদ্ধি ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া রাজ্য পরিচালনার ভার বহিতে হইত অহল্যাকে। ইহাতেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া মালীরাও এমন দেবদ্বিজদ্বেষী ও নৃশংস চরিত্র হইয়া উঠে যে লজ্জায় ঘৃণায় ধর্ম্মপরায়ণা অহল্যা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকিতেন। নিষেধ করিলে মালিরাও নৃশংসতার মাত্রা বাড়াইয়া দিত। ৯ মাস কাল পৈশাচিকতার চূড়ান্ত করিয়া মালীরাও উন্মাদ হইয়া আত্মহত্যা করে। প্রবাদ যে বিনা দোষে একজন নিরীহ প্রজার প্রাণদণ্ড দিয়া ঐ হতভাগ্যের মরণের পর মালীরাও জানিতে পারে সে নিরপরাধ। তীব্র অনুশোচনায় সে উন্মাদ হয়। ফলে এই শোচনীয় পরিণাম ঘটে।

কিন্তু যত নৃশংস যত পিশাচ হোক তবু ত সন্তান! মালীরাওয়ের বিয়োগ-বেদনার নিদারুণ আঘাতে অহল্যা অধীর হইয়া পড়েন। যেন শাবকহারা হরিণী। এদিকে সিংহাসন শূন্য। পূর্ণ করা চাই। অগত্যা মালবের শাসনভার অহল্যা গ্রহণ করেন।

মালীরাওয়ের শাসনকালেই লোকে অহল্যার বিদ্যা-বুদ্ধি ও শাসন দক্ষতার পরিচয় পাইয়াছিল। তিনি স্বয়ং শাসনকর্ত্রী হইলে রাজ্যের ছোট বড় সকলে তাঁহাকে রাণীর সম্মান দিল। আপত্তি তুলিলেন রাজ-পুরোহিত রঘুনাথ যশোবন্ত। মালবের স্বর্গীয় রাজারা পুরোহিতের কথামত চলিতেন—তা সে ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক। গতানু-গতিকের মোহ অহল্যার ছিল না; ছিল প্রজার কল্যাণ কামনা, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির আগ্রহ, প্রখর রাজবুদ্ধি, এবং প্রবল ন্যায়নিষ্ঠা। রঘুনাথ ইহা

জানিতেন এবং এই নারী যে তাঁহার অঙ্গুলিহেলনে চলিবে না বুঝিতে পারিয়াই প্রতিপত্তি-বিলোপের আশঙ্কায় অহল্যার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। শাস্ত্রের অকাট্য প্রমাণ, দেখাইয়া পূর্ব্বতন নরপতিদের নামোল্লেখ করিয়া রঘুনাথ অহল্যাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অহল্যা তাঁহাকে বলিলেন যে পূজার্চ্চনা বারব্রত সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিবেন অহল্যা তাহাই করিবেন। রাজ্যশাসন স্বতন্ত্র জিনিষ। ইহা লইয়া পুরোহিতের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

এমন করিয়া অপ্রিয় সত্য আর কেহ কখন রঘুনাথকে বলে নাই; তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দেয় নাই। সত্যযুগ হইলেও বা অভিশাপ দিয়া এই অপমানের শাস্তি দেওয়া চলিত কিন্তু কলিযুগে তাহা অসম্ভব। নীরবে অপমান সহ্য করাও চলে না। কি করিলে অহল্যার দর্প চূর্ণ হয় তাহার মন্ত্রণা করিতে রঘুনাথ ছুটিলেন পেশোয়ার খুড়া রাঘবদাদার কাছে। ষড়যন্ত্রের ইন্ধন যোগাইতে দুই চারিজন দেশদ্রোহী জুটিল। অনেক যুক্তি পরামর্শের পর রঘুনাথ ও রাঘবদাদা অহল্যাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে বহিশর্ক্রর আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ সময়ে নারীর স্থান অন্তঃপুরে— সিংহাসনে নয়। অবিলম্বে তিনি যেন সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া দত্তক-পুত্র লইয়া তাহাকেই রাজ্যের অধিপতি করেন। অন্যথায় বিপদ ঘটিবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অহল্যা বীরনারী, বীরজায়া। এই পত্র পাইয়া মনে মনে হাসিলেন এবং অঙ্কুরেই এই বিপ্লব বিনষ্ট করিতে রঘুনাথ ও রাঘবদাদাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ মলহর রাওয়ের পুত্রবধূ, বীরবর খণ্ডে রাওয়ের সহধর্ম্মিণী। তাঁহার স্থান অন্তঃপুর কি সিংহাসন কি রণক্ষেত্র সে বিচারের যোগ্যতা তাঁহার আছে। দত্তকপুত্র তিনি লইবেন না।

রাজদ্রোহ গুরুতর অপরাধ। শাস্তিও গুরুতর। ইহা যেন তাঁহারা কখন না ভোলেন।

দুরভিসন্ধি প্রশ্রয় পাইলে বাড়ে। সুতরাং অহল্যা পত্র পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠাইয়া রঘুনাথ ও রাঘবদাদাকে কারারুদ্ধ করিলেন।

যথা সময়ে রাজদ্রোহী দুইজনের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারকর্ত্রী স্বয়ং অহল্যা। রঘুনাথ আপনার ভ্রম ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রকাশ্য দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন। মানের লাঘব হইবে বলিয়া দাম্ভিক রাঘবদাদা না করিলেন অপরাধ স্বীকার না চাহিলেন মার্জ্জনা। পেশোয়ার খুড়ার কাছে নারীর বিচার একটা প্রহসন বৈত নয়! কিন্তু প্রহসন দাঁড়াইল বিয়োগান্ত নাটকে। অহল্যা রাঘবদাদাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রাজপুতের লোলুপদৃষ্টি যে মালবের দিকে রাঘবদাদা সে কথা জানিত। অহল্যাকে শিক্ষা দিতে সে রাণার রাজ্যে অতিথি হইল। পররাজ্য জয়ে ঘৃণিত গৃহশত্রুই পরম মিত্র। রাণা মৌখিক আপ্যায়নে মারাঠাকলঙ্ক রাঘবদাদাকে স্বর্গে তুলিয়া মালবের অন্ধিসন্ধি জানিয়া লইলেন। অহল্যা স্ত্রীলোক। সৈন্যসামন্ত দেখিলেই ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইবে। বলিতে গেলে একরকম বিনা যুদ্ধেই রাজ্য ও রাজ কোষের সঞ্চিত বিপুল অর্থ রাণার হইবে। রাঘবদাদার মুখে সত্য মিথ্যা জড়ানো এই সব কথা শুনিয়া রাণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাজপুতানায় 'সাজ' 'সাজ' রব পড়িয়া গেল।

গুপ্তচর আসিয়া অহল্যাকে এই সংবাদ দিল। তিনি রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রণাকক্ষে স্থির হইল রাজপুতের রাজ্যলিপ্সা পুরাতন ব্যাধি। ঔষধ দিয়া নিরাময় করিতে হইবে। রাণীর ডাক দেশেরই ডাক। রাজ্যের পাড়ায় পাড়ায়

দেশভক্তের সাড়া জাগিয়া উঠিল। তুকাজী স্বজাতি; চরিত্রগুণে সকলের প্রিয়; রণবিদ্যায় সুপণ্ডিত; দেশপ্রাণ। অহল্যা তাহাকেই করিলেন আসন্ন যুদ্ধের সেনাপতি। এদিকে পেশোয়া মধুরাও লোক পাঠাইয়া খুড়া রাঘবদাদার প্রতিহিংসাবৃত্তিকে এমন খোঁড়া করিয়া দিলেন যে তাহার আর চলিবার শক্তি রহিল না। রাজপুত সৈন্য বিপুল বিক্রমে মালবের অনতিদূরে আসিয়া পড়িল কিন্তু রাঘবদাদা আসিতে পারিলেন না। তুকাজী ও তাঁহার সহকারী শ্রীভাই সতর্ক ছিলেন। মারাঠা সেনার অতর্কিত আক্রমণে রাজপুত সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। রাণীর হইল জয়, রাণার পরাজয় ও সৈন্যক্ষয়।

পুত্রতুল্য তুকাজীকে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া অহল্যা জননীর স্নেহে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। রাজসরকারে যে যে বৃত্তি, বেতন ও রাজকর পূর্ব্বাপর নির্দ্ধারিত ছিল তাহার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হইল না।

অন্তর্বিপ্লব দেশের ও দশের অশান্তি ও ক্ষতির কারণ। ভবিষ্যতে যাহাতে ইহা না ঘটে অহল্যা সর্ব্বাগ্রে তাহার এক অভিনব উপায় বাহির করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়িয়া। অন্যান্য রাজা সানন্দে ইহাতে যোগ দেন। ফলে অহল্যার প্রতিনিধিরা অন্যান্য রাজসভায় এবং অন্যান্য রাজার প্রতিনিধিরা তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিয়া দৌত্য কর্ম্ম ও অনুসৃত রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া আবশ্যক মত তাহা সংশোধন করিতেন। মিলিয়া মিশিয়া কাজ। অপ্রীতির কোন কারণ ঘটিত না।

মালব রাজ্যে দুর্দ্দান্ত গোন্দ ও ভীল দস্যু ভয়ানক উপদ্রব করিত। তাহারা থাকিত নর্ম্মদা তীরে পাহাড়পর্ব্বতে। সেদিক দিয়া কাহারো যাতায়াতের উপায় ছিল না। করিলে পথিক প্রাণ হারাইত। ইহাদের দমন করিতে গিয়া বীর খণ্ডেরাও অকালে শমনের গ্রাসে পড়িয়াছেন। প্রজারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত। অহল্যা একদিন প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা

করিলেন যে মারাঠা বীর তাঁহার রাজ্য হইতে এই দস্যু ভয় দূর করিতে পারিবে তাহাকেই তিনি একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এই পুরস্কার লাভ করেন বীর যশোবন্ত রাও। তাঁহার বাহুবলে বিজিত পার্ব্বত্য দস্যুরা নরহত্যা ও লুণ্ঠন ছাড়িতে বাধ্য হয়। তাহাদের ভরণপোষণের জন্য দয়াময়ী অহল্যা "ভীলের কড়ি" বলিয়া এক কর স্থাপনা করেন। ইহার ফলে পর্ব্বতের পথ দিয়া যে কেহ বলদে করিয়া কোন কিছু লইয়া যাইত তাহাকেই প্রতি বলদে আধ পয়সা করিয়া ভীলেদের দিতে হইত। তাহাদের উপর অহল্যার এই আদেশ ছিল যে তাহারা রাজপথে পাহারা দিবে যাহাতে কেহ দস্যুবৃত্তি না করে। দৈবাৎ করিলে হারানো জিনিষ তাহাদের খুঁজিয়া দিতে হইবে। না দিলে তাহারা শাস্তি পাইবে। অহল্যার করুণার গুণে অসভ্য ভীল সৎপথের সন্ধান পায়। মালবরাজ্যেও দস্যুভয় দূর হয়। অশান্তি, উপদ্রবের মূলোচ্ছেদ করিয়া অহল্যা নিশ্চিন্ত মনে প্রজার অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও পথকষ্ট নিবারণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলেন। রাজকোষের দুই কোটী টাকা ছাড়া তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য ৪।৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল। এই অর্থে নিরন্নের অন্নকষ্ট ঘুচিল, জলাভাব ঘুচিল, দুর্গম পথ সুগম হইল। বহু দেবালয় ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। রাজ্যের স্থানে স্থানে দুর্গ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। অহল্যা দেখাইলেন যে ব্যবহার করিতে জানিলে অর্থে অনর্থ ঘটে না, ঘটে দেশের ও দশের কল্যাণ।

প্রজার অভাব অভিযোগ অহল্যা স্বয়ং শুনিতেন এবং সুবিচার করিতেন। অন্যায় অসত্যের উপর তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। প্রজার ধন সম্পদ বাড়িলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। ছলে বলে কৌশলে তাহার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না; কেহ যাচিয়া দিতে আসিলে ফিরাইয়া দিতেন। বলিতেন—

'ভগবান্ আমাকে দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। অন্যের ধন লইবার অধিকার আমার নাই—প্রয়োজনও নাই।' অথচ প্রকারান্তরে পরস্বাপহরণ না কি রাজনীতির একটা অঙ্গ !

বাসিয়া গ্রামে এক ধনাঢ্য বণিকের বিধবা অপুত্রক বলিয়া স্থানীয় উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীর নিকট দত্তক পুত্র লইবার অনুমতি ভিক্ষা করে। আইন অনুসারে অবীরার সম্পত্তি তাহার পরলোকান্তে ভূস্বামীর। এই বণিকজায়ার সম্পত্তিও তাই। কিন্তু সে দত্তকপুত্র লইলে এই আইন অচল। সুতরাং অহল্যার ক্ষতি লাভ খতাইয়া ঐ রাজকর্ম্মচারী তাহার আবেদন নামঞ্জুর করে। অহল্যার নিকট সকল প্রজার অবারিত দ্বার। অবীরা তাঁহার নিকট আবেদন করিলে তিনি সানন্দে তাহাকে দত্তকপুত্র লইবার আদেশ দেন এবং রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়া পাঠান যেন ভবিষ্যতে এইরূপ অভিযোগ আর না ঘটে। প্রজার ধন প্রজারই। তাহাতে লোভ করা অধর্ম্ম। রাজকর্ম্মচারী অপ্রস্তুত। বণিক-বিধবা অহল্যার জয় গান করিতে করিতে স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া দত্তক-পুত্র গ্রহণ করে। অহল্যার হৃদয় যে কত উচ্চ ছিল এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

তাঁহার রাজ্যে কারা গ্রামে দুই সহোদর থাকিত। তলপ দাস ও বারেম দাস। একান্নবর্ত্তী পরিবার। ধন-সম্পত্তি প্রচুর কিন্তু দুই জনেই নিঃসন্তান। এই অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হয়। হিন্দু নারীর বৈধব্যের মত দুর্ভাগ্য আর নাই। দুইজনের বিধবা স্ত্রী সঙ্কল্প করিল যে তাহারা আর সংসারের মধ্যে থাকিবে না, তীর্থবাস করিবে। কিন্তু বিষয়াশয় বিষম অন্তরায়। দুইজনে পরামর্শ করিয়া অহল্যার নিকট সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল যাহাতে তিনি তাহাদের বিষয়াশয় লইয়া তীর্থবাসের সাহায্য করেন। নির্লোভ অহল্যা বলিলেন, 'মা, আপনারা এক কাজ করুন। ধন-সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে জলাশয়,

দেবালয় ও ধর্ম্মশালা করিয়া দিন। সকলের উপকার হইবে; ভগবান আশীর্ব্বাদ করিবেন। আর ইহাতে আমিও আনন্দ পাইব।' বলা বাহুল্য এই অমূল্য ও নিঃস্বার্থ উপদেশ তাহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া প্রফুল্লমনে তীর্থবাসিনী হয়।

রাণী হইলেও অহল্যা তিলার্দ্ধ সময় অপব্যয় করিতেন না। তিনি বলিতেন সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। অবিশ্রাম কর্ম্মই জীবনের ধর্ম্ম। একটী মুহূর্ত্তও বৃথা কাটাইতে নাই। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ। স্নানান্তে পূজাহ্নিক। দানধ্যান। পুরাণাদি শ্রবণ। ব্রাহ্মণভোজন। আপনার নিরামিষ আহার। রাজকার্য্য। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাই ছিল তাঁহার কর্ম্মক্রম। সন্ধ্যাবন্দনার পর রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার মন্ত্রণাকক্ষে কাটিত। শয়ন কক্ষে যাইতেন রাত্রি ১২টায়। বার-ব্রত পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে এই ক্রমের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিত। অহল্যার আর একটী মহৎ গুণ ছিল। হিন্দুধর্ম্মের অন্ধ ভক্ত হইলেও অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন না। অহিন্দু প্রজাকেও পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। দুই-দুই ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন—হিন্দুও আমার সন্তান, অহিন্দুও আমার সন্তান।

তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় শ্রীক্ষেত্র, গয়া, কাশী, কেদারনাথ, দ্বারকা ও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এখনও বিদ্যমান। ইহার মধ্যে গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির ও নাটমন্দির শিল্প বৈশিষ্ট্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা তেজচন্দ্র কখন তীর্থযাত্রা করেন নাই। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"যেতে ত ইচ্ছে হয় কিন্তু রাণী ভবানী ও অহল্যাবাই তীর্থে তীর্থে এত কীর্ত্তি রেখে গেছেন যে এমন কিছু নাই যে আমরা গিয়ে করি। পুরুষ মানুষ। একটা লজ্জাও তো আছে। তাই যাই না।" বাস্তবিক এই দুই হিন্দুনারী তীর্থে তীর্থে কীর্ত্তির কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই।

অহল্যার দয়া ঝরিত অজস্র ধারায়। পশুপাখীও তাহাতে পরিতৃপ্ত হইত। তাঁহার ব্যবস্থামত তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র চারণক্ষেত্র ছিল। সেখানে তাহারা ইচ্ছামত ক্ষুধা মিটাইত, কেহ বাধা দিত না। দারুণ গ্রীষ্মে তিনি যেমন তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য দিতেন পথে পথে জলসত্র, তেমনই করিতেন ভার ও লাঙ্গলবাহী তৃষ্ণার্ত্ত বলদের জন্য জলের ব্যবস্থা।

এত গুণ থাকিলেও রাজরাণী অহল্যার চিত্তে অহমিকার নামগন্ধ ছিল না। তাঁহার কথায় ও কাজে ভগবানের ইচ্ছার জয় জয়কার উঠিত। লিখিতে পড়িতে জানিতেন ভালই। যাহাতে সৎশিক্ষা ও সদগ্রন্থের বহুল প্রচার হয়, দেশের যুবা শক্তি যাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও বীরত্বে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে ক্ষুণ্ণ হইতেন, অথচ নিন্দা করিলে রাগ করিতেন না। একবার একজন পণ্ডিত একখানি পুস্তক রচনা করিয়া অহল্যাকে উপহার দেন। আগাগোড়া অহল্যার স্তুতি। সুতরাং পুস্তকখানি নর্ম্মদাগর্ভে স্থান পায়। লেখককে অহল্যা বলেন যে স্তবস্তুতি দেবদেবীর জন্য। তাঁহাদের প্রাপ্য মানুষকে দিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। বারান্তরে পাণ্ডিত্যের এইরূপ অপপ্রয়োগ তিনি যেন না করেন। পণ্ডিতের কর্ত্তব্য বিদ্যাদান: লেখকের—সৎসাহিত্য প্রচার। অহল্যার নিকট অনেক কিছু শিখিয়া পণ্ডিত সভা ত্যাগ করে।

জীবনের শেষ ভাগে এই মনস্বিনী অপরিসীম বেদনা পান মুক্তা বাইয়ের সহমরণে। একটী পুত্র রাখিয়া যশোবন্ত মহাপ্রস্থান করেন। তখন সহমরণের যুগ। "মৃতে ম্রিয়েত পত্যৌ"—অর্থাৎ স্বামী মরিলে পতিব্রতাকে সহমৃতা হইতে হয় এই ধারণা বদ্ধমূল। মুক্তা মাতার নিকট "সতী" হইবার অনুমতি চাহিলেন। একমাত্র কন্যা সম্বল। বিপুল

সংসারে আপনার বলিতে আর কেহ নাই। মুক্তার কথা শুনিয়া অহল্যার মাথায় এক সঙ্গে শত বজ্রপাত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে মুক্তাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যাহাতে সে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করে। তাহারই মুখ চাহিয়া তিনি যে বাঁচিয়া আছেন! মুক্তা কিন্তু কোন কথা শুনিল না। তাহার দৃঢ় পণ—সে সহমরণে যাইবে। নর্ম্মদা তীরে চিতানলে মুক্তা বৈধব্যের হাত হইতে মুক্তি পাইল। অহল্যা তিন দিন না করিলেন জলগ্রহণ, না কহিলেন কাহারো সঙ্গে একটী কথা। সময় কাটিল শোকাশ্রুতর্পণে। কোথা তিনি চিতাশয্যায় শেষনিদ্রা যাইবেন, না তাঁহাকেই করিতে হইল কন্যাজামাতার শেষকৃত্য!

যেখানে সতীদাহ হয় সেখানে অহল্যা যশোবন্ত ও মুক্তার একটী স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। অপার মাতৃস্নেহের পবিত্র নিদর্শন এই মন্দির শিল্পসৌন্দর্য্যে অনুপম।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে অহল্যার শোকজর্জ্জর প্রাণ মহাকাশে বিলীন হয়। অলক্ষ্যে দেবতা তাঁহার পুণ্য চিতাগ্নিতে অমৃত সিঞ্চন করেন। অশরীরি বাণী বলে—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তিই বটে। শোক, দুঃখ, উদ্বেগ সংসারে তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আত্মীয়স্বজন বলিতে কেহ ছিল না। বহুর মধ্যে তিনি ছিলেন একা। শিরে বিপুল রাজ্যভার। কিন্তু নারী—মহামায়ার অংশ। সে নবনীর মত কোমল, বজ্রের মত কঠোর, তটিনীর মত উদার, ধরণীর মত ধৈর্য্যশীলা, অর্ঘ্যের মত পবিত্র। অহল্যার ত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজ্যশাসন, তাঁহার পুণ্য অনুষ্ঠান, দেশের সেবা, পবিত্র জীবন, ভগবানে ভক্তি এই কথাই বলে। ইহারই নাম নারীত্ব—দেবীত্ব। ইহা অবিনশ্বর।

রাণী কাত্যায়নী

যাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, বৃন্দাবনে দেব সেবা, সাধু সেবা, মাধুকরী বৃত্তি এবং গভীর কৃষ্ণ প্রেম, বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর, রাণী কাত্যায়নী সেই রাজা-সন্ন্যাসী পরম ভাগবত 'লালা' বাবুর অর্দ্ধাঙ্গিণী। কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের পৌত্রবধূ।

মুর্শিদাবাদ জেলায় রসোড়া গ্রামে ১১৮৫ সালে কাত্যায়নী জন্মলাভ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরমোহন ঘোষ। জাতিতে কায়স্থ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। অতিথি বৎসল; পিতৃপিতামহের ক্রিয়াকলাপ রক্ষণশীল। সহধর্ম্মিণী ছিলেন নিরীহা, ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবতী। মাতা-পিতার শিক্ষায় কাত্যায়নী লজ্জা, নম্রতা, সংযম, দয়ামায়া প্রভৃতি নারীজনোচিত সদ্‌গুণে মণ্ডিতা হইয়াছিলেন। ইহার উপর ছিল শ্রী।

কন্যা নয় বৎসরে পড়িতেই গৌরমোহন তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে থাকেন। ঘটকেরা নিত্য নুতন সন্ধান আনিয়া দেয় কিন্তু একটীও মনোমত হয় না। প্রতিবেশীরা কেহ কিছু বলিলে গৌরমোহন বলিতেন, 'মেয়ের বয়স বাড়চে তা কি আমরা বুঝি নে কিন্তু ঘর বর ভাল না পেলে করি কি। বরাতের ওপর ভরসা করে তাকে তো অপাত্রে দিতে পারি নে।' একদিন একজন ঘটক আসিয়া সংবাদ দিল যে কাঁদি গ্রামে একটী সুপাত্র আছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র, কৃষ্ণচন্দ্র। অগাধ বিষয় সম্পত্তি। সদ্বংশ। পাত্র দেখিতে সুশ্রী, লেখাপড়াও জানে। স্বভাব চরিত্র ভাল। কাত্যায়নীর যোগ্যবর। এই বংশের আদি পুরুষ হরেকৃষ্ণ সিংহ। তিনি নবাব সরকারে কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন

করেন। তাঁহার তিন পুত্র নারায়ণ, গৌরাঙ্গ ও বিহারী। বিহারীর চারি পুত্র দীনদয়াল, রাধাকান্ত, রাধাচরণ, ও গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গা-গোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র। গঙ্গাগোবিন্দ পৌত্রকে "লালাবাবু" বলিয়া ডাকিতেন। সেই জন্য "লালা বাবু" নামেই তিনি উত্তরকালে সুবিদিত হন। গঙ্গাগোবিন্দ প্রথমে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব সংগ্রাহক রেজা খাঁর অধীনে কানন্গুর কাজ করিতেন। পরে ভাগ্যবলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান হইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঘটকের মুখে কুলজী শুনিয়া গৌরমোহন বলিলেন "গরিবের সঙ্গে কি তাঁরা কুটুম্বিতা কর্ব্বেন ?" ঘটক বলিল—"দেওয়ানজীর কনে পছন্দ হলে অবস্থায় আটকাবে না। তাঁরা ভাল ঘর আর ভাল মেয়ে চান। টাকার কামড় নেই।" ঘটক চলিয়া গেলে গৌরমোহন ভাবিতে লাগিলেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইবেন কিনা। যিনি মাতৃ শ্রাদ্ধে পুরী হইতে কাঁদি পর্য্যন্ত লোকের ডাক বসাইয়া জগন্নাথদেবের অন্ন ভোগ আনাইয়া ব্রাহ্মণ ও কুটুম্ব ভোজন করাইবার সামর্থ্য রাখেন যিনি এই শ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারেন, দোর্দ্দণ্ড যাঁহার প্রতাপ সেই গঙ্গাগোবিন্দ সামান্য একজন গৃহস্থের কন্যাকে কুললক্ষ্মী করিবেন ইহা স্বপ্নের অতীত। কিন্তু ভাগ্য সহায় থাকিলে স্বপ্নও সত্য হয়। গৌরমোহন গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে দেখা করিয়া কন্যাদায়ের কথা বলিলেন। কথায় কথায় গঙ্গাগোবিন্দ গৌরমোহনের বংশ পরিচয় সাংসারিক অবস্থা ও কন্যার বিষয় যাহা জানিবার জানিয়া বলিলেন—"জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরের হাত। মেয়েটী দেখে যদি পছন্দ হয় আর ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবেই শুভকর্ম্ম ঘট্তে পারে।" গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে আমার কুঁড়েতে পায়ের ধূলো দেবেন ?" দেওয়ানজী বলিলেন—"সে কথা পরে জানাব।" কাত্যায়নীকে দেখিতে গিয়া

গঙ্গাগোবিন্দ ভাবী পৌত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন এবং একদিন শুভ লগ্নে কাত্যায়নী ও কৃষ্ণচন্দ্র পতি পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ-চন্দ্রের অন্নপ্রাশনে গঙ্গাগোবিন্দ প্রভূত ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পৌত্রের শুভ বিবাহে তিনি দুই হাতে উৎসবের উৎস খুলিয়া দিলেন।

সুপরিচিত স্নেহনীড়খানি ছাড়িয়া কাত্যায়নী নববধূ বেশে চোখের জল মুছিতে মুছিতে অপরিচিত সংসারে চিরদিনের বাসা বাঁধিতে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে রহিল পিতামাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ।

গঙ্গাগোবিন্দের প্রিয় পৌত্রের বধূ—বধূবরণ হইল সমাদরে। স্নেহ প্রীতি শত বাহু মেলিয়া কাত্যায়নীকে বুকে টানিয়া লইল। তাঁহার লজ্জা, নম্রতা, সুমধুর স্বভাব, গুরুজনে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট। জীবনের সাথীর গুণের পরিচয় পাইয়া লালাবাবুও আনন্দিত। তিনি ছিলেন আশৈশব বিদ্যানুরাগী। মেধা ও মনীষা থাকায় অল্পদিনে ইংরাজী, পার্শী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হন। জন্মান্তরের সুকৃতি বলে বিদ্যা তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ও রুচি মার্জ্জিত করিয়াছিল। তিনি দেখিলেন কাত্যায়নী লেখাপড়া জানেন না। লেখাপড়া না শিখিলে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘোচে না, অন্ধকারেই জীবন কাটে, এই বিশ্বাসে তিনি গোপনে কাত্যায়নীর শিক্ষার ভার লন। পাছে কেহ জানিতে পারিয়া গোলযোগ করে এই জন্য স্বামী-স্ত্রীর পাঠশালা বসিত অর্দ্ধরাত্রে। বলা বাহুল্য শিক্ষকের উৎসাহ ও ছাত্রীর আগ্রহ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধির সীমানায় পৌঁছাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই।

পুত্র, পৌত্র, পৌত্রবধূ, আত্মীয় স্বজন ও অতুল বিষয়বৈভবের বাঁধন কাটিয়া গঙ্গাগোবিন্দ পরলোক যাত্রা করিলে প্রাণকৃষ্ণ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি ছিলেন কৃপণ। যক্ষের মত ধন আগলাইয়া থাকিতেন। একবার তিনি লালাবাবুর চাকরকে একখানি ছোট কাপড়

দিলে সে লালাবাবুকে ঐ কথা বলে। ঐ সময়ে বল্লভীকান্ত দাস প্রাণ-কৃষ্ণের বিষয়সম্পত্তির প্রধান কর্ম্মচারী। লালাবাবু বল্লভীকান্তকে আপনার চাকরের জন্য একখানি দশ হাত প্রমাণ ধুতি আনিয়া দিতে বলেন। বল্লভীকান্ত এই কথা প্রাণকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলেন "চাকর পরবে দশ হাত ধুতি? বল কি হে! কৃষ্ণবাবুর যে বেজায় আবদার দেখছি! বাবুকে বোলো তিনি যেন নিজে রোজগার করে, চাকরকে দশ হাত কাপড়, জামা জুতো সব কিনে দেন। হুঁ, বলে আপনি পায় না—শঙ্করাকে ডাকে।" এই কথা লালাবাবুর কানে পৌঁছাইতে বিলম্ব হয় নাই।

সামান্য একখানা কাপড়ের জন্য পিতার বক্রোক্তিতে মর্ম্মাহত লালাবাবু রাজার সন্তান হইয়াও সতর বৎসর বয়সে চাকরী খুঁজিতে বাহির হন এবং বর্দ্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে গভর্ণমেণ্ট ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে উড়িষ্যার সরকারী মহলের দেওয়ানের পদ দেন। এই কাজ করিতে করিতে লালাবাবু কয়েকটী পরগণা কিনিয়া জগন্নাথদেবের নিত্যসেবার জন্য দৈনিক দশ টাকা খরচের মত কিছু জমি দান করেন।

ব্যয়কুণ্ঠ হইলেও প্রাণকৃষ্ণ অভিমানী পুত্রের দাস্যবৃত্তিতে আক্ষেপ করিতেন। বলিতেন—"আমার তো তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। কবে আছি কবে নেই। বিষয়াশয় কিছু সঙ্গে যাবে না। কৃষ্টবাবুরই থাকবে। গোলামী করে মরছে! বরাত, বরাত।"

বিদেশবাসের অসুবিধাসত্ত্বেও কাত্যায়নী স্বামীর সঙ্গে স্বর্গসুখ পাইতেন। লালাবাবু যদি কখন বলিতেন—"তোমার কষ্ট হচ্ছে, চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।" তিনি উত্তর দিতেন—"আমার কেন কষ্ট হবে, সে হচ্ছে তোমার। রাজার ছেলে চাকরী করচো।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার চালাচ্ছ।" লালাবাবু বলিতেন—"পুরুষ মানুষ, রোজগার না করে' বসে বসে খাওয়া কি ভাল। বাপ ঠাকুর্দ্দার যা আছে সে তো দর্জ্জীর দোকানের তৈরী পোযাকের মত অনায়াসেই পাব। সে পাওয়ায় আনন্দ নাই। আর এই পরিশ্রম করে যা পাচ্ছি সে যে আমার নিজস্ব জিনিষ। কত আনন্দের।"

পিতাকে দেখিবার জন্য লালাবাবুর প্রাণ ব্যাকুল হইত কিন্তু দুর্জ্জয় অভিমান দুই হাত দিয়া পথ আগলাইয়া থাকিত। পিতারও সেই ভাব। কিন্তু কোন পক্ষেরই অভিমান রহিল না। ১২১৫ সালে প্রাণকৃষ্ণ কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া লালাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়াই লালাবাবু কাত্যায়নীকে লইয়া কাঁদি রওনা হইলেন। রেলগাড়ী ছিল না। বাড়ী পৌঁছাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। পুত্রকে দেখিয়া মুমূর্ষু পিতার চোখে জল গড়াইয়া পড়িল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"এসেছিস বাবা, বৌমা এসেছ।" দুইজনের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"সব রৈল ; দেখো।" বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া লালাবাবু বলিলেন—"বাবা, আমায় ক্ষমা করুন।" প্রাণকৃষ্ণ অতি কষ্টে বলিলেন—"দোষ তো করিস নি। আচ্ছা, কল্লুম।" স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া দিবারাত্র প্রাণকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষা করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না।

পিতার দেহান্তে লালাবাবু দাসত্বশৃঙ্খল কাটিয়া বিপুল বিষয়সম্পত্তি দেখিতে লাগিলেন। কাত্যায়নী রাজরাণী হইলেন। কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্যসেবা, অতিথিসেবা, সদাব্রত প্রভৃতি সৎকার্য্যে দুইজনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। লালাবাবুর অধিকাংশ সময় পূজাহ্নিক, হরিনাম ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে কাটিত। কাত্যায়নী গৃহকর্ম্মের অবসরে স্বামীর কাছে বসিয়া শাস্ত্র পাঠ শুনিতেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া লালাবাবু অশান্তি বোধ করিতেন। তাঁহার মনে হইত জীবন বৃথা কাটিতেছে। ভোগে না আছে আনন্দ না আছে তৃপ্তি। সংসার পান্থশালা। একদল আসে একদল যায়। আজ যাহার সঙ্গে দেখাশোনা—কাল সে থাকিবে না। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনের এই দেহের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইলে কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইহারা কেহ আপনার নয়। আপনার বলিতে আছেন একজন - চির-কিশোর রাধাবল্লভ। পিতামাতা পতি, পত্নী, পুত্রকন্যা সকলই তিনি। কি করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এই চিন্তাই লালাবাবু সর্ব্বদা করিতেন।

লালাবাবুর মন যে দিন দিন সংসার হইতে সরিয়া যাইতেছে ইহা কাত্যায়নীর অগোচর ছিল না। দুর্ভাবনায় তাঁহার দিবারাত্র কাটিত। বহুদিন রাত্রে উঠিয়া দেখিতেন স্বামী আছেন কি নিদ্রিতাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ১২১৭ সালে লালাবাবু সত্যই সংসার ত্যাগ করিলেন। জনশ্রুতি—একদিন তিনি জমিদারী দেখিতে গিয়া সন্ধ্যার সময় এক গ্রামে উপস্থিত হন। সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন এক রজককন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে “বাবা, বেলা যে গেল, বাসনায় আগুণ দাও।” এই কথা শুনিয়া লালাবাবুর মনে হইল তাঁহারও তো জীবনের বেলা পড়িয়া আসিতেছে কিন্তু বাসনায় এখনও আগুণ দেওয়া হয় নাই। এখনও তিনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত। বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি কাত্যায়নীকে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। কাত্যায়নী এই ভয়ই করিতেন। স্বামীর সঙ্কল্প শুনিয়া তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। চোখে শ্রাবণের ধারা ঝরিতে লাগিল। কিন্তু তিনি সহধর্ম্মিণী। স্বামীর শ্রেয়োলাভে বিঘ্ন দিবেন কি বলিয়া। লালাবাবু অতুল ঐশ্বর্য্য, একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র শ্রীনারায়ণ ও প্রিয়তমা

পত্নীর মায়াপাশ কাটিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। কুলদেবতা রাধাবল্লভ রহিলেন পতিব্রতা কাত্যায়নীর নিবিড় বেদনার মূক সাক্ষী। বিরহের পবিত্র হোমানলে আপনার সুখ দুঃখ আহুতি দিয়া সতী পতির ধর্ম্মজীবনের সাফল্য কামনা করিতে লাগিলেন, স্বামীর বৈরাগ্যের পশ্চাদ্‌ভূমিতে আসন পাতিয়া।

এদিকে লালাবাবু বৃন্দাবনে গিয়া যমুনাপুলিনে একখণ্ড জমি কিনিয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বিগ্রহের নাম "কৃষ্ণচন্দ্রিমা।" এই মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। মন্দিরের জন্য রাজপুতানায় পাথর কিনিতে গিয়া তিনি মহা বিপদে পড়েন। ঐ সময়ে রাজপুতানার কয়েকজন রাজার সঙ্গে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের একটি সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। লালাবাবু যে রাণার নিকট পাথর কিনিতে গিয়াছিলেন তিনি এই সন্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করায় কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন লালাবাবুর প্ররোচনায় ঐ রাণা এইরূপ করিতেছে। সার চার্লস মেটকাফ তখন দিল্লীর দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে লালাবাবুকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দেন। হাতে হাতকড়া পরাইয়া লালাবাবুকে দিল্লীতে লইয়া আসিলে গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া লালাবাবুর পূর্ব্ব পরিচয় ও বংশ গৌরব জানিতে পারেন ও তাঁহাকে সসম্মানে মুক্তি দেন। দিল্লীতে থাকিবার সময় লালাবাবু কৃষ্ণচন্দ্রিমার সেবা চিরস্থায়ী করিতে বুন্দেল সহর, আলিগড় মথুরা প্রভৃতি স্থানে বহু জমিদারী কিনিয়া বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। এই মন্দির সংলগ্ন একটী অন্নসত্রও তিনি স্থাপিত করেন। ইহার

ব্যয় বাৎসরিক ২২০০০ টাকা। ইহা ছাড়া তিনি লক্ষাধিক টাকা দিয়া রাধাকুণ্ডের সংস্কার করিয়া উহা পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন।

ইহার পর নির্জ্জনে সাধন ভজনের জন্য তিনি গিরিগোবর্দ্ধনে বাস করিতে থাকেন। দিবারাত্র হরিনাম জপ, হরিনাম কীর্ত্তন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন। রাজা হইয়া ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা। কিন্তু ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা পান নাই। কৃষ্ণদাস বাবাজী তখনও কৃপা করিতে কুণ্ঠিত। শেষে লালাবাবু শেঠের বাড়ীতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। অভিমান ছিল বলিয়া এতদিন ইহা পারেন নাই। লালাবাবুকে দেখিয়া শেঠেরা স্থির থাকিতে পারিলেন না। পরম সমাদরে তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। সেই দিন কৃষ্ণদাস বাবাজীও দীক্ষা দিলেন।

লালাবাবু সাধন ভজন লইয়া বৃন্দাবনে; পতিপ্রাণা কাত্যায়নী বিষয় সম্পত্তি লইয়া শ্বশুরের ভিটায়। স্বামী দিলেন বোঝা ফেলিয়া, স্ত্রী লইলেন মাথায় তুলিয়া। শ্বশুরবংশের মানসম্ভ্রম যাহাতে বজায় থাকে, পুত্র নারায়ণ মানুষ হয়, দেবসেবা, অতিথিসেবা নিয়মিত চলে, প্রজারা সুখে থাকে এতগুলি কর্ত্তব্য তিনি না পালন করিলে, করিবে কে! যাঁহার করিবার কথা তিনি যে সন্ন্যাসী।

কাত্যায়নী ছিলেন বিদুষী। তিন চারি খানি আইনেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। জমিদারী সংক্রান্ত চিঠি পত্রের খসড়া তিনি নিজেই করিতেন। যে কর্ম্মচারী যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজ দিতেন এবং লক্ষ্য রাখিতেন কাজ ঠিক হইতেছে কি না। নায়েব গোমস্তা কেহ কোন প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়াছে জানিতে পারিলে তিনি অপরাধী কর্ম্মচারীকে দণ্ড দিতেন। বলিতেন, "আমার নারায়ণও যা, প্রজারাও তাই।"

গৃহদেবতার নিত্যসেবা ছাড়া কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী ও অন্যান্য দেবালয়ে তিনি প্রতিমাসে তিন চারি বার মহোৎসব দিতেন ও বহু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইতেন। কিন্তু সকল সময়েই তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত সুদূর বৃন্দাবনে স্বামীর চরণে।

যথাকালে নারায়ণের বিবাহ দিয়া কাত্যায়নী বধূ তারাসুন্দরীকে গৃহে আনিলেন। তিনিও একদিন বধূ হইয়া এই সংসারে আসিয়া যে আদর যত্ন পাইয়াছিলেন আপনার বধূকে সেই আদরে আপনার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার সন্তানাদি না হওয়ায় বংশ লোপের ভয়ে কাত্যায়নী পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন। অবশ্য ইহাতে তারাসুন্দরীর মত ছিল। দ্বিতীয় বধূর নাম করুণাময়ী। করুণাময়ী হইতেও বংশ-লোপের ভয় ঘুচিল না। অগত্যা কাত্যায়নী দুই বধূকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুরোধ করিলেন। ঘটিলও তাই। তারাসুন্দরীর পোষ্যপুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র ; করুণাময়ীর—ঈশ্বরচন্দ্র। প্রতাপ ও ঈশ্বর সহোদর ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

রাজাবাবু (নারায়ণ) সাবালক হইয়া বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লইলেও রাণী কাত্যায়নীকে হাল ধরিয়া থাকিতে হইত। কোন সমস্যা জটিল হইয়া উঠিলে তিনি সহজে তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

স্বামী সন্ন্যাসী বলিয়া তিনি বেশভূষা করিতেন না। কেবল সীমন্ত ও হাতের চিহ্ন দেখিয়া লোকে বুঝিত তিনি সধবা। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সে চিহ্নও একদিন সহসা বিলুপ্ত হইল। ১২২৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে লালাবাবু বৃন্দাবন ধামে গতায়ু হইলেন। আকস্মিক মৃত্যু। তিনি যমুনায় স্নান করিয়া মধুর হরিনাম করিতে করিতে গিরি গোবর্দ্ধনের আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে গোয়ালিয়রের মহারাণী লোকজন লইয়া উপস্থিত। দীক্ষা গ্রহণের পর লালাবাবু

বিষয়ীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। মহারাণী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবার উপক্রম করিতে তিনি তাড়াতাড়ি সরিয়া যান। সেই সময়ে মহারাণীর দেহরক্ষীর মধ্যে একজনের অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে লালাবাবু আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান হইলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তিনি বৈকুণ্ঠধামে যাত্রা করেন। নিদারুণ সংবাদ পাইয়া রাণী কাত্যায়নী জীবন্মৃতা হন। স্ত্রী পুত্র পরিবার বিষয়াশয় সকলই থাকিতে প্রবাসে দীনহীনের মত স্বামীর জীবনের অবসান হইল, একটিবার চোখের দেখাও ঘটিল না এই দুঃখে রাণী আরও কাতর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু দুঃখের যে এখনও অনেক বাকী এই সংবাদ তিনি জানিতেন না। জানিলেন যখন একমাত্র পুত্র রাজাবাবু তাঁহার বুকে শক্তিশেল হানিয়া অনন্ত কালপ্রবাহে বুদ্‌বুদের মত মিশাইয়া গেলেন। পতি শোক, পুত্র শোক। রাণী কাত্যায়নীর উঠিবার শক্তি রহিল না। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজা প্রতাপচন্দ্র বিষয় সম্পত্তি দেখিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দুই রাজার বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তিনি পাইকপাড়ার রাজবাটীতে প্রায়ই যাইতেন। রাণী কাত্যায়নী তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিতেন আবার পৌত্রের বন্ধু বলিয়া স্নেহও করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল কাজেই উৎসাহ দিতেন, সাহায্য করিতেন। তিনিও ইহার প্রতিদান দিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। রাণী কাত্যায়নী শোকের উপর শোক পান। বন্ধুকে হারাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বড়ই কাতর হন।

রাণী কাত্যায়নীর শোকের পাত্র তখনও পূর্ণ হয় নাই। রাজপরিবারে আবার মৃত্যু দেখা দিল। ১২৭৩ সালে ৪ঠা শ্রাবণ রাজা প্রতাপচন্দ্র মহাপথের পথিক হন। রাণী কাত্যায়নী ও বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক

চেষ্টা করিয়াও বাধা দিতে পারেন নাই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন প্রতাপচন্দ্রের চিকিৎসক। মাসে এক হাজার টাকা দর্শনী পাইতেন। পৌত্রকে বাঁচাইতে বৃদ্ধা রাণী টাকাকে টাকা মনে করেন নাই। তাঁহাকে হারাইয়া রাণী মৃতকল্পা হইলেন। পাইকপাড়া রাজ-পরিবারেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। রাজকুমারেরা নাবালক। রাণী একে বৃদ্ধা তাহাতে শোকে পাথর। বিষয়সম্পত্তি দেখিবার লোকাভাব। রাণী কাত্যায়নী বুঝিলেন এ সঙ্কটে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ভরসা। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন "ঈশ্বর, তোমার তো ভাই ছোট লাটের সঙ্গে খুব আলাপ। যদি বিষয়সম্পত্তি তাঁকে বলে কয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দেওয়াতে পার তবেই রক্ষা। নৈলে সব যাবে।" ছোটলাট বিডন সাহেবকে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। রাণীর আর একটী অনুরোধ ছিল—ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে থাকিলে রাজকুমারেরা যেন ওয়ার্ডসের অধীন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে বাধ্য না হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে ছোটলাট বাহাদুর রাণী কাত্যায়নীর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

ক্রমাগত শোক পাইয়া রাণী কাত্যায়নীর দেহ জরজর হইয়াছিল। তিনি দিবারাত্র উন্মনা থাকিতেন—কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। আয়ুসূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া আসিতেছিল। কিন্তু শোকের শেষ তখনও হয় নাই। রাজা প্রতাপচন্দ্রের কন্যা প্রভাবতী বিবাহের অল্পদিন পরে বিধবা হইয়া রাণীকে পাগল করিয়া দিল। মানুষের শরীরে আর কত সয়। ১২৭৫ সালে ৩রা ভাদ্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জামুয়াকান্দীর বাটীতে রাণী কাত্যায়নীর জীবনের অবসান হয়।

"কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,

বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপন-রূপে।”

লালাবাবুর গৃহত্যাগের পর পতিব্রতা কাত্যায়নীর চোখের জল কোনদিন শুখায় নাই। স্বামী কৃষ্ণপ্রেমে পাগল কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ বলিতে লালাবাবু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সেই হিন্দুনারীর ইহকাল পরকাল স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর একে একে পুত্র পৌত্র সকলেই তাঁহাকে অশ্রুসাগরে ডুবাইয়া গতপ্রাণ হয়। বিপুল বেদনার উপর বিপুল বিষয়সম্পত্তির দুর্ব্বহ বোঝা ও দুর্ভাবনা লাগিয়াই থাকিত। মৃত্যু সত্যই ভুবনমোহন স্বপ্নরূপে দেখা দিয়া এই শোকাতুরা নারীকে চির-নিদ্রার বর দেয়।

রাণী কাত্যায়নী আদর্শ নারী। অন্তঃপুরে থাকিয়া তিনি যে ভাবে রাজত্ব পরিচালনা করিতেন তাহা অনেক পুরুষ জমিদার পারেন কিনা সন্দেহ। ভগবান তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী করিয়াছিলেন, তিনিও তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। হুগলী কলেজে একটী ছাত্রবৃত্তি এখনও তাঁহার বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় দেয়। সাধারণের উপকার হইবে বলিয়া তিনি নানা স্থানে পথ-ঘাট, সেতু, পুষ্করিণী, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলা পাঠশালা ও সংস্কৃত টোলে রাণীর মত অর্থ সাহায্য করিতেন। এই পুণ্যবতীর ধর্ম্মকর্ম্ম ও দানধ্যানের ব্যয়ের পরিমাণ অন্যূন ১৬ লক্ষ টাকা। লালাবাবুর ত্যাগ প্রশংসনীয় কিন্তু রাণী কাত্যায়নী ভোগের মধ্যে থাকিয়া যে ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও অপূর্ব্ব।

রাণী রাসমণি

অসম্ভব যে কি করিয়া সম্ভব হয় এবং কেন হয় সে রহস্য একমাত্র তিনি জানেন যাঁহার অজানা কিছুই নাই ; সকল কারণের হাল ধরিয়া যিনি অনাদি অনন্ত কাল প্রশান্তমনে অলক্ষ্যে বসিয়া আছেন। কিন্তু যখন এই অঘটন ঘটে তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে না, সংশয় অবজ্ঞা লজ্জায় মাথা নত করে, দিকে দিকে জয়ধ্বনি রণিয়া উঠে।

ইহারই সাক্ষী রাণী রাসমণি। তাঁহার জন্ম দরিদ্র কৈবর্ত্ত গৃহে। সাল ১২০০। জন্মভূমি কোনা—২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালি সহরের কাছাকাছি ক্ষুদ্র পল্লী। চাষবাস ও ঘরামির কাজ করিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কায়ক্লেশে দিনপাত হইত। সুতরাং রাসমণির জীবনের রথ দুঃখদৈন্যের দুর্গম পথেই জয়যাত্রায় বাহির হয়। সে উষালগ্নে কোথায় না ছিল উৎসবের কোন শুভ আয়োজন, না ছিল কোন আড়ম্বর, এবং বিধাতা যদি স্বয়ং আসিয়া বলিতেন যে হরেকৃষ্ণের এই কন্যাটী কালে দয়াদাক্ষিণ্যে, দেশের ও দশের সেবায় যশোমন্দিরের সোণার সিংহাসন আলো করিয়া সমগ্র দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে, সে কথা বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিত না।

দরিদ্রের সংসারে অভাবের তাড়না নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয় না ; সেখানে দুঃখের অমানিশা পোহাইতে চায় না ; সে অন্ধকারে মনের ইচ্ছা বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া মনের কোণেই বনবাস করে। কিন্তু নিরীহ হরেকৃষ্ণ বিধাতার নামে বৃথা অভিযোগ ও সর্ব্বদা হা হুতাশ করিয়া, দুরবস্থার অপরাধ স্ত্রী রামপ্রিয়ার উপর অযথা চাপাইয়া দৈন্য দুঃখকে দুঃসহ করিয়া তোলেন নাই। "হরির ইচ্ছা" বলিয়া তাহাকে সহজ ভাবে লইয়াছিলেন। সেইজন্য পর্ণকুটীরে স্বর্ণ না থাক্ শান্তি ছিল।

দরিদ্রের ছেলেমেয়ে রৌদ্রে পুড়িয়া বর্ষায় ভিজিয়া, শীতে জড়সড় হইয়া, পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া বড় হয়। শৈশব হইতেই তাহারা শ্রমিক। ৬।৭ বৎসর বয়সে রাসমণিকে সংসারের অনেক কাজ করিতে হইত। খেলাধূলা লইয়া থাকিবার অবকাশ ঘটে নাই। আবাদের সময় হরেকৃষ্ণ থাকিতেন সারাদিন মাঠে; দারুণ রৌদ্রে মাঠে ভাত লইয়া যাইতে হইত রাসমণিকে। তরি তরকারী প্রায়ই থাকিত না; রাসমণি রামপ্রিয়ার সঙ্গে যাইতেন ডুমুর পাড়িতে, না হয় পুষ্করিণী হইতে শাক তুলিতে। এমনই করিয়া সংসার চলিত। কিন্তু রামপ্রিয়ার শিক্ষার গুণে রাসমণি কোন কাজেই বিরক্ত হইতেন না; 'পারিব না' বলিয়া অন্যায় আবদার ধরিতেন না।

হরেকৃষ্ণ সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানিতেন। দিনের কাজ সারিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেন। পাড়ার অনেকেই আসিত শুনিতে। রাসমণিও শুনিতেন। ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও ভগবানের চিরমধুর যুগলীলা শুনিতে শুনিতে বালিকা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত।

আট বৎসর বয়সে রাসমণিকে মাতৃহারা করিয়া রামপ্রিয়া দেহত্যাগ করেন। মা হারানো সন্তানের যে কত বড় দুর্ভাগ্য সে কথা বুঝিবার বয়স না হইলেও রাসমণি 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেন। আত্মীয়স্বজন বুঝাইত মা শরীর সারিতে বাপের বাড়ী গিয়াছে। শরীর সারিলেই ফিরিয়া আসিবে। রাসমণি কখন ভাবিতেন সত্যই বুঝি তাই, কখন 'মা এখন কেন আসছে না' বলিয়া হরেকৃষ্ণকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। তাঁহাকে ভুলাইতে গিয়া হরেকৃষ্ণের পত্নীশোক উঠিত দ্বিগুণ উথলিয়া। কেবল ইহাই নয়। রামপ্রিয়ার অভাবে সংসারের টানাটানি শতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনই করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল। রাসমণি পড়িলেন দশ ছাড়িয়া একাদশের কোঠায়। বিবাহের বয়স। হরেকৃষ্ণ বিব্রত। কিন্তু রাসমণির দুঃখের কঠোর তপস্যা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে জানবাজারের জমিদার প্রীতরাম মাঢ় একটী সুন্দরী পাত্রী খুঁজিতেছিলেন। রাসমণির রূপ ছিল দেখিবার বস্তু। পাত্রপক্ষের মনে ধরিল। হরেকৃষ্ণ স্বজাতি। সুতরাং এক শুভ রাত্রে শুভ লগ্নে প্রীতরামের কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির শুভ বিবাহ হইয়া গেল। সমানে অসমানে কুটুম্বিতা—অতএব ধনবানের মর্য্যাদার খাতিরে শুভকর্ম্ম ঘটিল জানবাজারে জমিদার গৃহে। রাসমণির এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা সতীলোকে রামপ্রিয়াকে বলিতে ছুটিল হরেকৃষ্ণের গোপন অশ্রু! হায়, আজ যদি সে থাকিত!

বিবাহান্তে রাসমণিকে বিভবের বেদিকায় বসাইয়া হরেকৃষ্ণ আত্মীয় স্বজন লইয়া আপনার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখদৈন্যের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। প্রাণ রহিল জানবাজারে পড়িয়া।

বিবাহে দূরের পথিক আসে কাছে। পর হয় আপনার। অজানার সঙ্গে হয় জানাজানি, মাখামাখি। সেই একজনকে কেন্দ্র করিয়া হৃদয় সমস্ত পৃথিবীকে ভাল বাসিতে শিখে—জীবন ফলে ফুলে ভরিয়া উঠে। রাজচন্দ্রের আরো দুইবার বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু সে নামে। বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি বিপত্নীক হন। গণনায় রাসমণি রাজচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষ কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তিনিই প্রথম।

ধনীর সংসার—আত্মীয় অনাত্মীয়ের হাট বলিলেই চলে। রাসমণি নব বধূ—সকলের আদরের পাত্রী। প্রীতরাম 'বৌমা' বলিতে অজ্ঞান। নূতন জীবন—স্বপ্নের মত কাটে। মাঝে মাঝে হরেকৃষ্ণ আসিয়া রাসমণিকে দেখিয়া যান। কখন কখন আত্মীয়েরা আসে। তাহারা

দেখে—তাহাদের 'রাসি' সেই আগের 'রাসিই' আছে—সেই সরল হাসি, সেই মিষ্ট কথা, সেই সরল মন। পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কেবল বেশভূষায়, রূপলাবণ্যে।

১২১৩ সালে রাসমণির প্রথমা কন্যার জন্ম হয়। প্রীতরাম ঘটা করিয়া পৌত্রীর নাম রাখেন পদ্মমণি। ইহার পর আসে কুমারী; কুমারীর পর করুণাময়ী। সর্ব্বশেষে আসে জগদম্বা। করুণাময়ীর বয়স যখন এক বৎসর তখন প্রীতরাম পদ্মমণির বিবাহ দেন সিঁথী নিবাসী রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে। প্রথমা পৌত্রীর বিবাহে প্রীতরাম ব্যয় করেন দুই হাতে। ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়।

প্রীতরাম ছিলেন **self-made** বা আপন-গড়া লোক। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন প্রীতরাম দুই সহোদর রামতনু ও কালীপ্রসাদকে লইয়া জানবাজারের জমিদার মান্নাবাবুদের বাড়ীতে পিসিমাতার আশ্রয় লন। এখানে সামান্য ইংরাজী ও বাংলা শিখিয়া তিনি কলিকাতার কেল্লায় সৈন্যের রসদ সরবরাহের কাজ আরম্ভ করেন। এই কাজ করিতে করিতে তিনি একজন সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় যান। সেখানে নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। উদ্যোগী পুরুষের প্রতি চঞ্চলা কমলার অচঞ্চল স্নেহ। রাজা রামকান্ত প্রীতরামকে নাটোরের অস্থায়ী দেওয়ানী পদ দেন। স্থায়ী দেওয়ান আসিলে প্রীতরাম কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার সৌভাগ্যের পালা। অর্থ, মানসম্ভ্রম কিছুরই অভাব নাই। অভাব গৃহলক্ষ্মীর। সে অভাবও শীঘ্র দূর হয়। মান্নাবাবুদের যুগলবাবু পরম আগ্রহে তাঁহাকে জামাতা করেন। প্রীতরামের দুই পুত্র— হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র। প্রীতরাম বাঁচিয়া থাকিতে হরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। পুত্রশোকের অসহ্য বেদনা বুকে ধরিয়া প্রীতরাম মহাযাত্রা করেন।

পিতার পরলোকান্তে রাজচন্দ্র বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। অনেকে ভাবিয়াছিল বিষয় বিভবের মোহে অন্ধ হইয়া রাজচন্দ্র সুপথ ছাড়িয়া কুপথে চলিবেন। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বনাশের সর্ব্বগ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। কি করিলে কুবেরের ভাণ্ডার দুই দিনে নিঃশেষ হয় সে যুক্তি দিবার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু রাসমণির প্রেমের প্রভাবে কোন অঘটন ঘটে নাই। রাসমণির সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া রাজচন্দ্র কোন কাজে হাত দিতেন না। স্বার্থহানির ক্ষোভে অনেকে তাঁহার এমন একটা উপনাম দিত যে তাহা অখ্যাতির না হইলেও পুরুষের পক্ষে গৌরবের নয়। কখন কাণে উঠিলে রহস্যপ্রিয় রাজচন্দ্র সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

সেকালে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা "নৈব চ" হইলেও রাসমণি রাজচন্দ্রের কাছে গোপনে বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এখন তাহা কাজে লাগিল।

দারিদ্র্যের কষ্ট যে কি দুঃসহ রাসমণি শৈশবেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই দারুণ অগ্নি পরীক্ষার করুণ স্মৃতি এখন দিন পাইয়া তাঁহাকে ব্রতী করিল দীন দুঃখীর অভাব মোচনে, নানা সৎকার্য্যে। উদার রাজচন্দ্রের উৎসাহ হইল তাঁহার সহায়।

রাসমণির প্রথম অবদান কলিকাতার বাবুঘাট। ইহা চাঁদপাল ঘাটের সংলগ্ন। ইহার উপলক্ষ হরেকৃষ্ণের স্বর্গলাভ। তখন জান-বাজার হইতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিলে বাঁধানো ঘাটের অভাবে স্নানার্থীরা বড় অসুবিধায় পড়িত। চতুর্থীর দিন রাসমণি গঙ্গাস্নানে আসিয়া এই অসুবিধা ভোগ করেন এবং বাড়ী গিয়া রাজচন্দ্রকে এই স্নানঘাটটী বাঁধাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। তাঁহার সদিচ্ছা পূর্ণ করিতে রাজচন্দ্র কালবিলম্ব করেন নাই। ১২৩৮ সালে ঘাট বাঁধাইয়া

দিয়া রাসমণি জানবাজার হইতে গঙ্গাস্নানের পথ বাঁধাইয়া দেন। পথের নাম হয় বাবুরোড—বর্ত্তমান নাম কর্পোরেসন ষ্ট্রীট। ইহা ছাড়া নিমতলার শ্মশান ঘাট, আহিরীটোলার স্নানঘাট ও চাঁদনী এই পুণ্যবতীর কীর্ত্তি এবং তাহার শক্তিকেন্দ্রের স্বর্ণাসনে বসিয়া বদান্য রাজচন্দ্র—মুখে প্রশান্ত হাসির অনাবিল চন্দ্রালোক।

রাসমণির জীবনের চিত্র আঁকিতে গিয়া প্রথমেই মনে পড়ে রাজচন্দ্রের কথা। বস্তুতঃ এমন স্বামী সৌভাগ্য, এমন বিরাট আকাশের আশ্রয় না পাইলে তাঁহার গৌরবের স্বর্ণচ্ছটা দিকে দিকে ছড়াইত কি না সন্দেহ!

রাজচন্দ্র ছিলেন সদালাপী, উদারপন্থী, বিদ্যোৎসাহী। ইহার উপর বিপন্নের সাহায্যে দৃঢ়ব্রত, মুক্তহস্ত। কোন প্রার্থীকে একবার "হাঁ" বলিলে শত প্রতিকুল অবস্থার সাধ্য ছিল না যে "না" বলায়। একবার একজন পরিচিত ইংরাজ বণিককে ব্যবসার জন্য ৮০০০০ টাকা ঋণ দিবার কথা দিয়া সম্পন্ন রাজচন্দ্র সংবাদ পান বিপন্ন প্রার্থী কপর্দ্দকহীন। ব্যবসার অবস্থা শোচনীয়। তাঁহাকে ঋণ দেওয়া আর টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া একই কথা। কিন্তু রাজচন্দ্রের যে কথা সেই কাজ। ইংরাজ বণিক যথাসময়ে ঐ টাকা পান এবং নষ্টভাগ্য ফিরাইয়া আনিয়া রাজচন্দ্রের ঋণ পরিশোধ করেন।

১৮২৯ সাল ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে সহমরণ প্রথা রাজবিধি বলে বন্ধ হয়। ইহার নিয়ন্ত্রণে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ যে সকল উদারপন্থী ভারতবাসী লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহায় ছিলেন, রাজচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

রাজভাষা প্রচলনের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। কিন্তু সিন্ধুপারের সরস্বতীর হিন্দু পূজারী বড় একটা জোটে

না। বেণ্টিঙ্ক সাহেব পড়েন ভাবনায়। ডাক পড়ে উদারপন্থী দলের। ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা স্থায়ীত্ব লাভ করে। নাম হয় হিন্দু কলেজ। চাঁদার খাতায় রাজচন্দ্রের নাম উঠে হাজারের কোঠায়। উপরন্তু ১০ জন ছাত্রের পড়িবার সমস্ত ব্যয়ভার বহিতে তিনি রাজী হন। তাঁহার অবর্ত্তমানে রাসমণি এই ভার বহিতেন আনন্দে।

ব্যবসায়ী মহলে রাজচন্দ্র ছিলেন সকলের প্রিয়। তাঁহার মূল্যবান যুক্তি পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইত। ব্যবসায় বুদ্ধিতে তাঁহার কাছে বড় বড় ব্যবসায়ী হার মানিতেন। একবার Exchangeএ আফিম নীলাম ডাকের দিন ঝড় বৃষ্টিতে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভাগ্যক্রমে দুর্য্যোগ আরম্ভ হয় রাজচন্দ্র সেখানে পৌঁছাইলে। যথা সময়ে নীলামের ডাক আরম্ভ হয়। অন্য কেহ না থাকায় রাজচন্দ্র ২৫ হাজার টাকায় সমস্ত আফিম ডাকিয়া লন। ঝড় বৃষ্টি থামিলে মাড়োয়ারী ব্যাপারীরা Exchangeএ পৌঁছিয়া শোনে রাজচন্দ্রবাবু আফিম ডাকিয়া লইয়াছেন। তখন সকলে মিলিয়া রাজচন্দ্রকে ঐ আফিম আবার নীলামে উঠাইতে অনুনয় বিনয় করায়, তিনি আবার ডাক আরম্ভ করেন। পঁচিশ হাজার হইতে ডাক উঠে ৭৫ হাজারে। ৫০ হাজার টাকা লাভ করিয়া ভাগ্যবান রাজচন্দ্র বাড়ী ফেরেন।

বেলেঘাটায় প্রীতরামের দুইটী আড়ত ছিল; একটী নুণের, অপরটী বাঁশের। এই বাঁশের ব্যবসায় হইতে তাঁহার "মাঢ়" উপাধির উৎপত্তি। বেলেঘাটায় কোন খাল না থাকায় ব্যবসার বড় অসুবিধা হইত। রাজচন্দ্রের উদ্যোগে ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর সমবেত চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট খাল কাটিয়া তাঁহাদের অভাব দূর করেন। ইহাতে রাজচন্দ্র নগদ টাকা ছাড়া খালের ভিতর তাঁহার যে জমি পড়িয়াছিল তাহাও বিনামূল্যে দান করেন। খাল হইলে বিপদে পড়ে যত দীনদুঃখী।

গভর্ণমেণ্ট খাল কাটিয়া পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা করিয়া দেন। খেয়ায় পয়সা লাগে। তাহারা পায় কোথা! রাজচন্দ্রের মুখে রাসমণি সকল সংবাদ পাইতেন। দীনদুঃখীর অসুবিধায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যাহাতে তাহারা বিনা কড়িতে পারাপার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে রাজচন্দ্রকে ধরিয়া বসেন। তাঁহার কোন কামনাই রাজচন্দ্র অপূর্ণ রাখিতেন না। সুতরাং বিনা কড়িতে পারাপার করিতে পাইয়া দীন দুঃখীর দল বাঁচে।

১২৪০ সালে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় রাজচন্দ্র ও রাসমণি তাঁহাদের ভাণ্ডার খুলিয়া অনশন মৃত্যুর হাত হইতে যে কত লোককে উদ্ধার করেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

রাজচন্দ্রের নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে "রায়" উপাধি দিয়া গুণগ্রাহীতার পরিচয় দেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের পর সদাশয় মেটকাফ সাহেব অস্থায়ীভাবে বড়লাটের কাজ করেন। এই মহামতি রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং "মেটকাফ হল" নাম দিয়া কলিকাতায় যে সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয় তাহাতে রাজচন্দ্র ৫০০০ টাকা দেন।

১২৪৩ সালে ৪৯ বৎসর বয়সে রাজচন্দ্রের দেহান্তর ঘটে। শ্রাদ্ধে যে যে কাজ করিলে স্বামীর আত্মা পরলোকে তৃপ্ত হয় রাসমণি তাহার একটীও বাদ দেন নাই। ইহাতে ব্যয় হয় ৫৫ হাজার টাকা।

রাসমণি এখন বিধবা। প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকারিণী। সন্তানের মধ্যে তিন কন্যা ও তিন জামাতা। বিবাহিতা তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর মৃত্যু ঘটে রাজচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে। তিনি তৃতীয় জামাতা মথুরামোহনের হাতেই কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বাকে দান করেন।

স্ত্রীলোকের হাতে এত সম্পত্তি থাকা ভাল নয় বলিয়া অনেকে রাসমণিকে একজন ম্যানেজার রাখিতে পরামর্শ দেন। কলিকাতার কোন বিখ্যাত ব্যক্তি রাজচন্দ্রের কাছে ১॥ লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইয়া এযাবৎ পরিশোধ করেন নাই। ইনিই ম্যানেজার নিয়োগের বিশেষ পক্ষপাতী হন এবং তিনি ম্যানেজার হইলে রাসমণির আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকিবে না, বিষয়ের আয়ও চতুর্গুণ বাড়িবে এই সব অত্যাবশ্যক কথা যথাস্থানে নিবেদন করেন। বুদ্ধিমতী রাসমণি দেখিলেন যে টাকা আদায়ের এই চমৎকার সুযোগ। ম্যানেজার করিবার লোভ দেখাইয়া তিনি সুদ সমেত ১॥ লক্ষ টাকা আদায় করেন। তারপর তাঁহাকে বলেন যে বিষয় সম্পত্তি তিন জামাতা দেখিবেন, বাহিরের কাহাকেও ম্যানেজার রাখিবার প্রয়োজন নাই। অতি লোভে কেহ কেহ নষ্ট হয়। ঐ ভদ্রলোকের ঠিক সেই দশা ঘটে।

বিষয়সম্পত্তি তিন জামাতাকে পালাক্রমে দেখিতে দিয়া রাসমণি পূজার্চ্চনা, বারব্রত ও নানা সদনুষ্ঠানে ব্রতী হন। দেবদ্বিজে ভক্তি, দীনহীনে দয়া, সৎকর্ম্মে মতি দিন দিন বাড়িতে থাকে। রাসযাত্রা তিনি মহোৎসবে পরিণত করেন। ইহাতে তাঁহার ব্যয় হইত প্রায় ২০০০০ টাকা। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার সময় জানবাজারের জমিদারবাটী অপূর্ব্বশ্রী লাভ করিত।

১২৪৫ সালে রাসমণি জানবাজারের প্রসিদ্ধ রূপার রথ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রথ গড়িবার ফরমাস পায় দেশী স্বর্ণকার। জামাতারা হেমিল্টন প্রভৃতি সাহেবের দোকানে রথ গড়াইবার প্রস্তাব করেন কিন্তু রাসমণি তাহা ঘটিতে দেন নাই। সেটা স্বদেশীযুগও নয়, অসহযোগেরও যুগ নয় কিন্তু দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতা রাসমণি গর্হিত কাজ মনে করিয়াছিলেন। জামাতারা বলিয়াছিলেন যে

সাহেবের দোকানের কাজ ভাল। তাহারা সময় মত রথ গড়িয়া দিবে। দেশী কারিকর কাজ করিবে খারাপ, গড়িতে দেরীও করিবে। এ বৎসর রথ প্রতিষ্ঠা করা চলিবে না। রাসমণি সে কথায় কাণ দেন নাই। যাহাতে ঠিক সময়ে রথ প্রস্তুত হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেশী কারিকর আনাইয়া তাহার ব্যবস্থা এবং রথযাত্রার দিন ঐ রথ প্রতিষ্ঠা করেন।

দশভূজার পূজার তিন দিন আত্মীয় অনাত্মীয়, আহুত অনাহুত দীন দরিদ্রের আনন্দ কোলাহলে, সমবেত কণ্ঠের 'মা' 'মা' রবে, বাদ্যধ্বনিতে মনে হইত সত্যই বুঝি আনন্দময়ী আসিয়াছেন।

একবার নবপত্রিকা স্নানের সময় বাজনা লইয়া গোলযোগ ঘটে। বাবু রোডে একজন ইংরাজ বাজনা থামাইতে বলায় রাসমণির লোকজন সে কথা না শুনিয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে গঙ্গায় নবপত্রিকা স্নান করাইয়া আনে। ঐ ইংরাজ পুলিশে এই খপর দেয়। পুলিশ নোটিশ জারী করে যে সরকারী রাস্তা দিয়া বাজনা বাদ্য লইয়া শোভাযাত্রা করিলে পুলিশের অনুমতিপত্র লইতে হইবে। বাবু রোড রাসমণির। তিনি গভর্ণমেণ্টকে পুলিশের এই ধর্ম্মহানিকর আদেশের কথা জানাইয়া উহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুরোধ না রাখায় তিনি লোকজন দিয়া জানবাজার ষ্ট্রীট ও বাবু রোডে চলাচলের পথ বন্ধ করেন। গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান যে যেহেতু রাস্তাটী তাঁহার সে হেতু তিনি কাহাকেও তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে দিবেন না। ফলে পুলিশের নোটীশ বাতিল হয়। আপনার রাস্তায় ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার পাইয়া রাসমণি রুদ্ধ পথ মুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার এই সাহসের কথা, এই জয়ের প্রশংসা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়।

রাজশক্তির প্রাণ প্রজার ভক্তি। এই ভক্তির যেখানে শেষ, অকল্যাণের সূত্রপাত সেখানে। প্রতিনিধির ভুলে রাজশক্তি যখন এই

অকল্যাণকে জাগাইয়া তোলে, তখন সে দুর্দৈব যে বৈধভাবে রোধ করিবার চেষ্টা করে সেই প্রকৃত রাজভক্ত।

দরিদ্রের উপর উৎপীড়ন রাসমণি সহিতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া সামর্থ্য দিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। পূর্ব্বে গঙ্গায় মাছ ধরিয়া যাহারা সংসার চালাইত তাহাদের কোন ট্যাক্স দিতে হইত না। কিন্তু জলপুলিশ জলকর বলিয়া একটী নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিলে দরিদ্র কৈবর্ত্তেরা ঐ ট্যাক্স দিতে বাধ্য হয়। গভর্ণমেণ্টকে আবেদনের পর আবেদনে কোন ফলই হয় না। কলিকাতার বিত্তশালী লোকের দ্বারে দ্বারে তাহারা সাহায্য ভিক্ষা করিয়া মরে কিন্তু কাহারও চিত্ত তাহাদের দুঃখে গলে না। নিরুপায় হইয়া সকল কৈবর্ত্ত রাসমণির শরণ লয়। কর্ম্মচারীমুখে তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি দেন অভয়। পরদিন কাশীপুর হইতে মেটেব্রুজ পর্য্যন্ত গঙ্গার সমস্ত অংশ তিনি বাৎসরিক ১০ হাজার টাকায় জমা করিয়া লন। যথা সময়ে দলিল রেজিষ্ট্রারী হয়। দুই চারি দিন পরে, তিনি কর্ম্মচারীদের আদেশ দেন বয়ায় বয়ায় নদীতে যাতায়াতের পথ বন্ধ করিতে, যেন কোন জাহাজ, ষ্টীমার বা নৌকা যাইতে না পায়। এ কাণ্ড কখন ঘটে নাই। চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া যায়। পুলিশ কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠায়। রাসমণি জানান যে তিনি অনেক টাকা দিয়া খাজনা লইয়াছেন। জাহাজ, ষ্টীমার যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যায়। তাঁহার লোকেরা একটাও মাছ ধরিতে পারে না। কাজেই তাঁহাকে এই উপায় করিতে হইয়াছে। পুলিশ জোর করিয়া পথ খুলিয়া দেয়। রাসমণি দেন মোকদ্দমা জুড়িয়া। এদিকে গভর্ণমেণ্টকেও বার বার এই জলকর রহিত করিতে অনুরোধ করিতে থাকেন। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া গঙ্গার

জলকর তুলিয়া দেন। এই মোকদ্দমায় দরিদ্রকে বাঁচাইতে রাসমণি জলের মত অর্থ ব্যয় করেন। কৈবর্ত্তেরা পূর্ব্বের মত অবাধে মাছ ধরিতে পাইয়া তাঁহার জয়গান গাহিতে থাকে।

প্রবলের ধর্ম্ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করা। কিন্তু ঘটে বিপরীত। লাভ যাহাই হৌক, প্রবল দুর্ব্বলকে পেষণ করিতে ছাড়ে না। মাত্রা যখন ছাড়াইয়া যায় তখন হয় গীতার সেই "সম্ভবামি যুগে যুগে" বাণী সফল। দর্পীর দর্প হয় চূর্ণ, অত্যাচারীর অত্যাচার হয় শেষ, দুর্ব্বলের কণ্ঠে জাগে বন্দনা।

জমিদারী মকিমপুরে নীলকরের উপদ্রব প্রজার সহ্যের সীমা ছাড়াইলে রাসমণি যে দুর্জ্জয় সৎসাহস দেখাইয়া তাহা দমন করেন তাহা শতমুখে প্রশংসা করিয়া শেষ হয় না। উৎপীড়িত প্রজারা জানবাজারে "রাণী মা"কে তাহাদের দুর্দ্দশার কথা জানায়। রাসমণির এই রাণী উপাধি গভর্ণমেণ্ট দেন নাই; দিয়াছিল দেশের লোক। রাসমণি তৎক্ষণাৎ মকিমপুরের নায়েব বনমালী ঘোষকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে পত্র লিখিয়া পাঠান। প্রজাদের অভয় দিয়া বলেন, "বাবা, আমি ৫০ জন পাইক পাঠাচ্ছি। তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা ছেলেপুলে নিয়ে আমার কাছারী বাড়ীতে থেকো। নীলকরদের জুলুম আমি বন্ধ করে দেবই"। প্রজারা নিশ্চিন্তমনে মকিমপুরে ফিরিয়া যায়। শীঘ্রই নীলকর ডোনাল্ড সাহেব ও তাহার কর্ম্মচারীরা অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি পায়। ফৌজদারী মামলা বাধে। যশোরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার। রাসমণির পক্ষে দুইজন বড় ব্যারিষ্টার ও উকিল। মামলাতে রাসমণিই জয়লাভ করেন। তখন হইতে নীলকরের নিষ্ঠুরতার শেষ হয়।

প্রজারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহাই ছিল রাসমণির প্রধান লক্ষ্য। তাহাদের সকল প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিতেন। মকিমপুরের

প্রজাদের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি "টোনার খাল" কাটাইয়া দেন। ব্যয় হয় ১০ হাজার টাকা। এক দিকে মধুমতী অন্যদিকে নবগঙ্গা। এই দুই নদীর মধ্যে টোনার খাল। ইহাতে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে।

বিবাহের পর রাসমণি একটীবারও কোণায় যান নাই। ইচ্ছা ছিল কিন্তু উপায় ছিল না। শ্বশুরবংশের সম্ভ্রম দিত বাধা। জন্মভূমি—স্বর্গাদপি গরীয়সী। রাসমণি জামাতাদের কোণা যাইবার উদ্যোগ করিতে বলেন। ঐ সঙ্গে ত্রিবেণীতে স্নান সারিয়া আসিবেন সে কথাটাও জানাইয়া রাখেন। লোকজন যায় কোণার বাড়ী মেরামত করিতে। বাড়ী মেরামত হইলে প্রায় ৩৫ বৎসর পরে কোণার ঘাটে লাগে রাসমণির নৌকা। সঙ্গে বহু দাসদাসী, চাল, ডাল, বস্ত্র, টাকা কড়ি। কোণার দরিদ্র পল্লীতে আনন্দের হাট বসে। সকলের অভাবের অবসান হয়। পরদিন ত্রিবেণী স্নান। সেখানে যথাযথ দানধ্যান করিয়া রাসমণি কোণায় ফিরিয়া করেন মহোৎসব। হালিসহরে একটী ঘাটের ব্যবস্থাও হয়। পর বৎসরে তিনি এই ঘাটটী উৎসর্গ করেন।

ইহার পর নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ সারিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দেখিতে যাত্রা করেন। তখন পথ ঘাট ভাল ছিল না। চোর ডাকাইতের ভয় ছিল খুব বেশী। পাল্কীর ব্যবস্থা হয়। রাসমণি বলেন যে দাসদাসী তাঁহার সঙ্গে যাহারা যাইবে সকলেরই পাল্কী চাই। তাহাই হয়। যাইবার সময় তিনি সুবর্ণ রেখার তীর হইতে যতদূর ভাল রাস্তা নাই ততদূর একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়া যান। পুরীতে অন্নব্রহ্ম। জাতিভেদ নাই। পুরীধাম তাঁহার বড় ভাল লাগে। পূজার্চ্চনা, দানধ্যানে, তিন দিন কাটাইয়া রাসমণি

নূতন রাস্তা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। পাণ্ডারা আশাতীত দক্ষিণা ও প্রণামী পায়; জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য রাসমণি ১০০০ টাকা দান করেন।

৫।৬ মাস পরে গঙ্গাসাগর হইতে সদলবলে ঘুরিয়া আসিয়া রাসমণি বারাণসী তীর্থ দেখিবার উদ্যোগ করেন। তখন কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ ছিল দুরূহ ব্যাপার। পথ শুধু সুদীর্ঘ নয়, দুর্গম। লোকে শেষ উইল করিয়া বাটীর বাহির হইত। বেশীর ভাগই হয় পথে না হয় তীর্থে মৃত্যুমুখে পড়িত। রাসমণির আদেশে ২৫ খানি বজরা প্রস্তুত হয়। আপনার যে যেখানে আছে সকলেই যাইবে; এমন কি দাসদাসী, কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত। বিরাট ব্যপার। ছয়মাসের উপযোগী চাল ডাল ও অন্যান্য জিনিষে বজরা বোঝাই। যাত্রার সব ঠিক। পুরোহিত দিনস্থির করিয়া দিলেন। তিনিও সহযাত্রী। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সঙ্গে মহামারী ও অকালমৃত্যু।

করুণাময়ী রাসমণির আর কাশী যাওয়া ঘটিল না। নিরন্ন, পীড়িত, ও আর্ত্তের সেবা ছাড়িয়া পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনা গেল নিভিয়া। তিনি জামাতাদের বলিলেন, "অন্নহীনকে অন্ন না দিয়ে কাশী গেলে অন্নপূর্ণা হবেন বিরূপ। কালভৈরব দেবেন তাড়িয়ে। কাশী যাওয়া এখন থাক্। অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের নাম নিয়ে যাতে দুর্ভিক্ষ থামে তোমরা তাই কর। টাকার জন্য চিন্তা নাই।" কাশীর মত মহাতীর্থের প্রলোভন জয় করিয়া এমন কথা কেবল রাসমণির মুখেই বাহির হইয়াছিল; আর কখন শোনা যায় নাই। সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী সকলেই চায় আপনার কল্যাণ—নির্ব্বাণ, মোক্ষ, ধনৈশ্বর্য্য এই সব। পরের জন্য কেহই মাথা ঘামায় না।

*কেহ কেহ বলেন কাশী যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে রাসমণি স্বপ্নে দেখিতে পান যেন অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে কাশী না গিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতে আদেশ দিতেছেন। সেই জন্য তিনি কাশী যাত্রা স্থগিত রাখেন।

প্রবাদ—দক্ষিণেশ্বরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাও প্রত্যাদেশের পরিণতি। এই দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যয় হয় প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। মন্দিরের জমি লইয়া মোকদ্দমা বাধে নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, সাতক্ষীরার প্রাণনাথ চৌধুরী ও অন্যান্য জমিদারের সঙ্গে কিন্তু জয়ী হন রাসমণি। ১২৬২ সালে স্নানযাত্রার দিন যুগাবতার পরমহংসদেবের সাধনার পীঠ এই পুণ্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসেন। প্রত্যেক পণ্ডিত পান গরদের ধুতি, একটী করিয়া মোহর ও যাতায়াতের পাথেয়। অসংখ্য অনাথ আতুর পায় অন্ন বস্ত্র। মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি কিনিয়া তিনি উহা দেবোত্তর করিয়া দেন। আয় হইতে নিত্য সেবা চলে। তাঁহার বহুজন্মের তপস্যাফলে করালবদনা কালীর পূজারী হন জগদ্বরেণ্য পরমহংসদেব। দক্ষিণেশ্বর হয় পরম তীর্থ। সংসার-তাপ জুড়াইবার স্থান।

রাসমণির ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি দুইই ছিল প্রখর। ইহা সচরাচর ঘটে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যেখানে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আতিশয্য সেখানে বিষয়-বুদ্ধির স্থানাভাব; যেখানে বিষয়-বুদ্ধির প্রতিপত্তি সেখানে ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ। রাসমণির সৎকার্য্যে ব্যয় ছিল যেমন বিপুল, সদুপায়ে আয় ছিল ততোধিক। তাঁহার হাতে বিষয় সম্পত্তি অনেক বাড়িয়াছিল। জমিদারীর আয়, ভবানীপুর, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানের বাজারের আয়, ও কোম্পানী কাগজের সুদে তাঁহার ধনভাণ্ডার ছিল

পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার দূরদর্শিতা ছিল অসামান্য। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোম্পানী কাগজের বাজার একেবারে পড়িয়া যায়। সকলেই বেচিতে পাইলে বাঁচে অথচ কিনিবার লোক নাই। এমনই অবস্থা। একখানি কোম্পানী কাগজ বেচা দূরে থাক, রাসমণি মাটীর দরে অনেক টাকার কাগজ কিনিয়া রাখেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া লোকে অবাক। কিন্তু সবাক হয় প্রশংসায় যখন বিদ্রোহ থামিলে কাগজের দর চড়ে এবং রাসমণি অল্প মূল্যে খরিদ-করা কাগজ চারিগুণ লাভে হস্তান্তর করেন।

বিদ্রোহের সময় রাজভক্ত রাসমণি গভর্ণমেণ্টকে সৈন্যের রসদ যোগাইয়া, হাতী দিয়া, টাকাকড়ি দিয়া প্রভূত সাহায্য করেন। এই বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে একবার বিপদে পড়িতে হয়। একদল গোরা তাঁহার বাটীর কাছাকাছি দোকানে ঢুকিয়া উৎপাত করায় তাঁহার দৌহিত্রেরা গোরাদের তাড়াইয়া দেন। ইহাতে তাহারা ক্ষেপিয়া উঠে এবং দল বাড়াইয়া রাসমণির বাটীতে জোর করিয়া ঢুকিয়া অনেক ক্ষতি করে। গোরাদের ভয়ে সকলেই বাটী ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। যান নাই রাসমণি। তলোয়ার লইয়া একাকী বাটীতে ছিলেন। সুখের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ এই উপদ্রবের প্রতিবিধান করেন। সৈন্যেরা রাসমণির দুই একজন চাকরকে জখম করে ও কিছু কিছু আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া রাসমণি আদালত হইতে উহা আদায় করেন।

বিদ্রোহের ভস্ম হইতে জন্মলাভ করে ইনকাম ট্যাক্স বা আয় কর। অসমর্থ প্রজারা আবার রাসমণির শরণাপন্ন হয়। আপনার তহবিল হইতে তাহাদের দেয় কর গভর্ণমেণ্টে জমা দিয়া রাণী শরণাগতের দুর্ভাবনা দূর করেন।

আজীবন দেশের ও দশের সেবা করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে এই পুণ্যবতী নারী কালীঘাটে আদি গঙ্গাগর্ভে জগন্মাতার কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তাঁহার দেহরক্ষার সময় জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি ও কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা, ও তিন জামাতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার আগমনী গাহিবার বৈতালিক ছিল না কিন্তু বিজয়ার বিদায়-রাগিনী সহস্রকণ্ঠে উদ্গীত হইয়া বাংলার নরনারীকে নিবিড় শোকাচ্ছন্ন করে।

উচ্চ কুলে না জন্মিলেও কি স্নেহ করুণায়, কি দান ধ্যানে কি সদনুষ্ঠানে কি ধর্ম্মানুরাগে আশ্রিতপালিনী রাণী রাসমণির আসন বহু উচ্চে। তাঁহার কথা উঠিলে পরমহংসদেব বলিতেন—"ওরে রাণী যে সে মেয়ে নয়। মায়ের অষ্টনায়িকার একজন।" এ-যুগের তুলনায় রাসমণিকে শিক্ষিতা বলা চলে ন', কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ, যাহা না কি শিক্ষার পরম ও চরম উদ্দেশ্য, তাঁহার জীবনে যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহা এ যুগে দুর্লভ বলিলেও চলে। বোধ হয় সেই জন্য তিনি যুগাবতার ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

রাসমণি নাই কিন্তু তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী আছে; তাঁহার বাঁধানো গঙ্গার ঘাট আছে; রূপার রথ আছে; টৌনার খাল আছে, নাই কি! কবিবর মাইকেল বলিয়াছেন—

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

রাণী রাসমণি সেই ধন্যা নারী।

মহারাণী স্বর্ণময়ী

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। নবাবী আমলের স্মৃতি ও বিস্মৃতির সন্ধিক্ষণে বাংলার এক নিভৃততম পল্লীগ্রামে একটী স্বর্ণপ্রতিমা অমরার স্বর্ণ ছড়াইতে একজন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অবতরণ করেন। স্থান—বর্দ্ধমান জেলায় ভাটাকুল। সাল ১২৩৬, তারিখ ২৬শে অগ্রহায়ণ। ধরার অঞ্জলী পাকা ধানে ভরিয়া হেমন্তলক্ষ্মী শিশু অতিথিকে বরণ করিয়া লন। দিগঙ্গনা মঙ্গল শঙ্খ বাজায়।

লক্ষ্মীর দক্ষিণ হাতের দাক্ষিণ্য যে কি বস্তু রামতনু জানিতেন না। সামান্য কয় বিঘা জমিজমার উপসত্বে কোন রকমে দিনপাত হইত। তাঁহার স্ত্রী পূর্ণিমাসুন্দরী ছিলেন তাঁহার "দুখের ঘরে সুখের চির মধুর হাসি। সরল লজ্জা, কোমল ব্যঙ্গ, গভীর ভালবাসাবাসি।" নবজাতা কন্যা অপরূপ সুন্দরী। যে দেখিত সেই বলিত—"তিলির মেয়ে ত নয় যেন অপ্সরী। গোবরে পদ্মফুল।" মানুষের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই বদ্ধ। কেবল একজন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিয়া বালিকাকে দেখিয়া বলিয়াছিল "এ মেয়ে রাজরাণী হবে। অনেক লোককে পুষবে। খুব যশ হবে।" ভিখারীর কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। আকাশ কুসুম যে! ফুল যেখানেই ফুটুক, গন্ধ বিলাইয়া আপনি সার্থক হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চারিদিকে যাহারা থাকে তাহাদেরও সার্থক করে। ক্ষুদ্র বালিকার দয়ামায়ার যাদুমন্ত্রে প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হইত। অন্তরে দাক্ষিণ্যের মন্দাকিনী। কিন্তু দারিদ্র্যের গিরিগর্ভে আবদ্ধা। গোমুখী কতদূরে কে জানে! ইচ্ছা থাকিলেও অর্থ দিয়া কাহারও সাহায্য করা অসম্ভব, কারণ পিতা দরিদ্র। কিন্তু বালিকার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা

কুলাইত তাহা তিনি করিতেন। কাহারও বাড়ীতে অসুখ, রোগীর শিয়রে সারদা। কেহ শোকার্ত্ত—সারদা তাহার ব্যথার ব্যথী। কাহারও সংসারে গৃহিণী একা সকল কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না, সারদা মধ্যে মধ্যে এটা ওটা সেটা করিয়া দেন। পিতামাতা ইহাতে সানন্দে প্রশ্রয় দিতেন।

রিক্ততার তপস্যায় তাঁহার কাটে এগার বৎসর। তপস্যার শেষে সদয় প্রজাপতি তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যের বর দেন। ঐ সময়ে কাশীমবাজারের বিখ্যাত নন্দী রাজবংশের রাণী হরসুন্দরী রাজকুমার কৃষ্ণনাথের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছিলেন। ভাটের মুখে সারদার সুলক্ষণ, সুরূপ ও সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া রাণীমাতার তাঁহাকেই পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা হয়। সে যুগে পাত্রী নির্ব্বাচনে বংশ, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও ঠিকুজীকোষ্ঠীর মিলনই ছিল মুখ্য, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব ছিল গৌণ। রাণী হরসুন্দরী আপনার রাজপ্রাসাদে অনেকগুলি পাত্রী আনাইয়া নির্ব্বাচনের ভার দেন পাত্রের উপর। ইহাদের মধ্যে সারদাসুন্দরীকেই কুমার কৃষ্ণনাথের মনে ধরে। বিবাহের দিনস্থির করিয়া রাণী দরিদ্র রামতনুকে সংবাদ দেন। সারদাকে কাশিমবাজারে পাঠাইয়া রামতনু ও পূর্ণিমাসুন্দরী বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। কন্যার আশাতীত সৌভাগ্যের সুসংবাদে তাঁহারা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পান। ১২৪৭ সালে শুভ বৈশাখে কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর প্রপৌত্র ও রাজা হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথের সঙ্গে সারদার শুভমিলন ঘটে। গোত্রান্তরের সঙ্গে সারদার নামান্তরও হয়। রাণী হরসুন্দরী আদর করিয়া পুত্রবধূর নাম রাখেন "স্বর্ণময়ী"। এই নামেই "সারদা" বিশ্ববিশ্রুতা।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী—"কান্ত বাবু"—প্রথম জীবনে "কান্ত মুদী" ছিলেন। পরে তাঁহার সৌভাগ্যের শুভগ্রহ ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে কোটিপতি

—রাজ্যেশ্বর হন। নবাব সিরাজুদ্দৌলার উদ্যত রাজদণ্ডের ভ্রূকুটিতে ভয় না পাইয়া তিনি এক সময় হেষ্টিংস সাহেবের প্রাণরক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ হেষ্টিংস সে ঋণ কড়ায়গণ্ডায় পরিশোধ করিয়াছিলেন।

স্বর্ণময়ীর যখন বিবাহ হয় তখন কৃষ্ণনাথ নাবালক; বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে। বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনাথ পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা রাজা হরিনাথ আদর্শ জমিদার ছিলেন। সে যুগের ইংরাজী-নবিশেরা স্বধর্ম্মে ঘৃণা করিয়া পরধর্ম্মে অনুরাগী হইতেন। কিন্তু ইংরাজী শিখিয়াও রাজা হরিনাথের স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ও দেবদ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার প্রজাবাৎসল্য, দানধ্যান, বাঙ্গালীকে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিবার আগ্রহ এবং বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ দেখিয়া সকলেই তাঁহার গুণগান করিত।

কুমার কৃষ্ণনাথ ওয়ার্ডসের অধীনে ইংরাজী ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। কিন্তু যে সকল মহৎ গুণে ইংরাজ রাজত্বে সূর্য্যদেব কখন অস্ত যান না তাহার অনেক কিছু না শিখিয়া, শিখিয়াছিলেন অনাচার। তবে তিনি পিতার সদগুণেরও কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ সাবালক হইয়া বিপুল সম্পত্তির অধিপতি হন। পর বৎসর লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহাকে রাজোপাধি দেন। সম্পত্তি হাতে আসিলে রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার গৃহশিক্ষক রাজা দিগম্বর মিত্রকে একলক্ষ টাকা গুরুদক্ষিণা দেন। হেয়ার স্কুল প্রাঙ্গণে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে তাহা নির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয় তিনি বহন করেন। বাংলার দ্বিতীয় "দাতাকর্ণ" বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও তিনি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা ও সময়ে সময়ে অর্থ সাহায্য করিতেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বর্ণময়ীকে স্বয় বাংলা লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখাইয়াছিলেন। রাজার মৃগয়াতেও খুব স

ছিল। কৃষ্ণনাথ রূপবান, স্বর্ণময়ী রূপসী। দুইজনের মিলিয়াছিল ভাল। কিন্তু রাজ্য ও দাম্পত্যসুখ রাজার ভাগ্যে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গোপাল দফাদার বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে গহনা চুরির সন্দেহে সিপাহী গম্ভীর সিংহ ও রাজবাটীর অন্যান্য ভৃত্যেরা মারিয়া আধমরা করে। তদন্তে আসিয়া পুলিশ গম্ভীর সিংহকে আসামী সাব্যস্ত করিয়া চালান দেয় এবং রাজা কৃষ্ণনাথের প্ররোচনায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকেও আসামী শ্রেণীভুক্ত করে। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে লোক পাঠান। তাহারা অকৃতকার্য্য হইলে বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রমোহন চাটুয্যে রাজবাটী খানাতল্লাসী করিয়া রাজাকে গ্রেপ্তার করেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে তিনি খালাস পাইয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাটীতে পলাইয়া আসেন। ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু ঘটে। রাজার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। রাজাও পিস্তলের গুলিতে আত্মঘাতী হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

"I, Sri Rajah Chrisnonath Roy, write, I part with the desire of life solely from the fear of being disgraced as I was not concerned in the matter of Gopal's case, nor did I beat or maltreat him. This I solemnly avow. It is only on account of the Deputy Magistrate Chandra Mohan Chatterjee that such excessive measures have been adopted towards me. I therefore write this letter that no one else may incur blame on account of my parting with my own life.

Everything is written in my will and testament etc."

ইহার ভাবার্থ—গোপালের মোকদ্দমার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। আমি তাহাকে মারপিট করি নাই। পাছে অপদস্থ হই এই ভয়ে আমি আত্মঘাতী হইলাম। ডেপুটী চন্দ্রমোহন চাটুয্যের জন্ম ব্যাপার এতদূর গড়াইল। আমার আত্মহত্যার জন্য কেহ দায়ী নয়। সকল কথা আমার উইলে লেখা আছে।"

মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে রাজার কিছুই হইত না কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে অপমৃত্যু আছে, খণ্ডন করিবে কে!

আঠার বৎসর বয়সে স্বর্ণময়ী অনাথা হন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। যেমন অতর্কিত তেমনই মর্ম্মান্তিক। কি পাপে, কাহার শাপে, এই নিদারুণ মনস্তাপ কে বলিয়া দিবে। নিয়তি নির্ব্বাক।

বিপদ কখন একাকী আসে না। পতিশোকে স্বর্ণময়ী আকুল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুইখানি উইল দাখিল করেন। একখানিতে রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার মুর্শিদাবাদের বাগানবাড়ী বানজেঠিয়ায় "কৃষ্ণনাথ বিদ্যালয়" বলিয়া একটী স্কুল ও তাহার পাশে একটী হাসপাতাল করিতে সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীকে দিয়াছেন। কন্যার বিবাহের জন্য কিছু টাকা ও বিধবা স্বর্ণময়ীকে মাসিক ১৫০০ টাকা দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু রাণীকে পোষ্যপুত্র লইতে নিষেধ করা হইয়াছে। অন্য উইলে রাণীকে ছয়বার পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দেওয়া আছে। তাহাতেও বংশরক্ষা না হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে একটী কলেজ স্থাপনা করিবেন। দুই উইলের Executor রাজার এটর্ণি ষ্ট্রেণ্টেল সাহেব।

স্বামী গেল, সম্পত্তি গেল। কন্যাকে লইয়া সহায়হীনা বিধবা অকূলে ভাসিলেন। চারিদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন। কাণ্ডারী নাই। তরণী বুঝি ডুবিল। স্বর্ণময়ী কাতর প্রাণে বিপদবারণ মধুসূদনকে ডাকিতে

ঢাকিতে শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে "ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আছি"। ভগবানের নিত্যকালের অভয়মন্ত্র। উৎসবের দিনে কলরবের মধ্যে তাঁহার ধ্বনি কোথায় ডুবিয়া যায় ; সম্পদে কেহ শুনিয়াও শোনে না। কিন্তু বিপদের ঘন ঘটা যখন ঘনাইয়া আসে, অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জন করে, তখন এই অভয় মন্ত্র প্রাণে ভরসা জাগায়, বল দেয়।

ঘোর দুর্দ্দিনে রাজকর্ম্মচারী রাজীবলোচন রায় স্বর্ণময়ীর সহায় হন। অন্ধকার কাটিয়া যায়। রাজীবলোচন দূরদর্শী, সাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী পুরুষ। তিনি বিধবার বিষয়োদ্ধারে অগ্রসর হন। তাঁহার পরামর্শে রাণী স্বামীর উইল অগ্রাহ্য করাইতে কোম্পানীর নামে সুপ্রিম কোর্টে এক মামলা রুজু করেন। এই সময়ে স্বর্ণময়ী আর একজন বিপদের বন্ধু পান। ইনি শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা এটর্ণি হরচন্দ্র লাহিড়ী। সুপ্রিমকোর্টের ফুলবেঞ্চে বিচার হয়। রাণীর কৌসুলি সঙ্গেবিল টেলর ক্লার্ক; সহকারী মর্টন। এক্‌জিকিউটরের কৌসুলি কর্কেণ ও ম্যাকফার্সন। কোম্পানীর পক্ষে এডভোকেট জেনারল লীথ, এবং কৌসুলি প্রিন্সেপ ও রীচি। এই মামলায় নবীনচন্দ্র বলিয়া একজন সাক্ষী বলে—"রাজা কৃষ্ণনাথ ইংরাজীতে যে উইল করিয়াছিলেন রাজার ইচ্ছানুসারে আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে সেই উইলের বাংলা অনুবাদ করি। আমি অনুবাদ করি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা লিখেন। উইল অনুবাদের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এক্ষণে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটরী।"

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সুপ্রিমকোর্ট রায় দেন যে রাজা কৃষ্ণনাথ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় উইল করেন নাই। উইল করিবার শক্তি

তাঁহার ছিল না। সেই জন্য এই উইল অগ্রাহ্য। রাণী জয়লাভ করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। রাণী হরসুন্দরী সুপ্রিমকোর্টের সদর আমীন হরচন্দ্র ঘোষের এজলাশে এই মর্ম্মে নালিশ করেন যে কৃষ্ণনাথ অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার কোন অধিকার নাই। রাণী স্বর্ণময়ীরও পতিধনে কোন দাবী দাওয়া থাকিতে পারে না। এই নালিশের কোন ফল হয় নাই। কিন্তু স্বর্ণময়ীর বিপদের জের মিটিতে চায় না। ভারত সরকার সুপ্রিমকোর্টে এই বলিয়া মোকদ্দমা রুজু করেন যে রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মঘাতীর সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। প্রধান বিচারপতি রায় দেন আত্মঘাতীর বিষয়সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য এই আইন এ দেশে অপ্রচলিত। গবর্ণমেণ্টের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়।

বিপদসাগর পার হইয়া রাণী স্বর্ণময়ী হরচন্দ্র লাহিড়ীকে নগদ ১০ হাজার টাকা ও শাল, রুমাল প্রভৃতি পুরস্কার দেন। রাজীবলোচনের ঋণ পরিশোধের নয়। তাঁহাকে স্বর্ণময়ী আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন।

মামলায় মামলায় স্বর্ণময়ী ঋণগ্রস্তা হইয়াছিলেন। উপায় ছিল না। ইহার উপর স্বর্গগত স্বামীরও বহু ঋণ ছিল। স্বর্ণময়ী সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেন ঋণমুক্তির দিকে। একে ত স্বামী আত্মহত্যার পাপ লইয়া পরপারে গিয়াছেন, তাহার শাস্তি আছে; তাহার উপর যে ঋণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অশান্তিও তাঁহার আত্মাকে কত কষ্টই না দেয়। জীবনে তিনি স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিবার অবকাশ পান নাই, নিয়তি সাধে বাদ সাধিয়াছে। কিন্তু মরণে ত সম্বন্ধ ঘোচে নাই। যাহাতে তিনি পরলোকে শান্তি পান সেই কাজই যে স্ত্রীর ধর্ম্ম।

স্বর্ণময়ীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও রাজীবলোচনের সুপরিচালনায় ক্রমে ক্রমে বিপুল ঋণ পরিশোধ হইয়া জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্বর্ণময়ী স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পান।

বাল্যের অন্তঃসলিলা দয়াদাক্ষিণ্যের মন্দাকিনী এতদিনে বিশ্বের কল্যাণে বাহির হইবার গোমুখী খুঁজিয়া পাইল। বাঁধন-হারা স্রোত। তাহার অপূর্ব্ব কলতানে বিশ্বের নিমন্ত্রণ। শঙ্খ বাজাইয়া পথ দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন রাজীবলোচন। সে রব শুনিয়া হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, সকলে ছুটিয়া আসিল। কেহ সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া, কেহ অঞ্জলী ভরিয়া পান করিয়া, কেহ বা কুম্ভ ভরিয়া ধন্য হইল। স্পর্শে কত দরিদ্রের দুশ্চিন্তা সোণা হইয়া গেল। যে পথ দিয়া সে মুক্তধারা যায় অনাথ, আতুর, আর্ত্ত, নবজীবন পায়।

প্রার্থীর কামনা পূর্ণ করিয়া স্বর্ণময়ী আপনার জীবনের অপূর্ণতার বেদনা ভুলিয়া থাকিতেন। স্কুল, চতুষ্পাঠী ও চিকিৎসালয় স্থাপনা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন এবং অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন কল্পতরু। তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান—

১।	বহরমপুর জলের কলের জন্য	১,৫০,০০০৲
২।	উত্তর-বাংলায় দুর্ভিক্ষ নিবারণে	১,২৫,০০০৲
৩।	মেডিকেল কলেজ ছাত্রীনিবাস নির্ম্মাণে	১,০০,০০০৲
৪।	ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের হোষ্টেল নির্ম্মাণে	১০,০০০৲

একবার একজন পুলিশ কর্ম্মচারী স্বর্ণময়ীর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিতে আসিয়া ৫০০ টাকা পান। তিনি ভাবিয়াছিলেন বড় জোর ৫০৲ পাইবেন। আর একবার একজন ব্রাহ্মণ রাজীবলোচনকে অনুরোধ করেন যে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় রাণীকে বলিয়া এমন কোন ব্যবস্থা তিনি করুন। রাজীবলোচন বুঝিতে পারিলেন

রোগ দুরারোগ্য কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিতে না পারিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন "দেখুন, এখানে এ রোগের তেমন ভাল চিকিৎসক নাই। আপনাকে মাসহরা দিচ্ছি। তাতে আপনার সংসারও চলবে, চিকিৎসাও হবে।" ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য আসেন নাই। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই শুনিয়া তিনি ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে রাজীবলোচন বলিলেন—"আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। এক থালা চিনি আপনাকে নিতে হবে।" ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলেন না। থালা লইয়া চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে গিয়া শুনিলেন যে থালাখানি রূপার। দাম ৫০০ টাকার কম নয়। ব্রাহ্মণ অবাক। এমন দৃষ্টান্ত শত শত আছে। দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ স্বর্ণময়ী রাজরাণীর মত করিতেন, অথচ আপনি থাকিতেন সাধারণ বিধবার মত। একাহার, ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচারিণী।

বাংলার ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর কলেজকে দ্বিতীয় শ্রেণী কলেজে অবনত করিলে দানশীলা স্বর্ণময়ী কলেজের সমস্ত দায়ীত্ব লইয়া উহাকে পুনরায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। ইহাতে তাঁহার বার্ষিক ১৬ হইতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইত। সাধারণের মঙ্গল হয় এমন কোন কিছু কাজে স্বর্ণময়ীর ব্যয় সঙ্কোচ ছিল না। তাঁহার অগাধ আয়ের অধিকাংশ দান ধ্যান পূজা পার্ব্বণ ও পরোপকারে ব্যয় হইত। তাঁহার বদান্যতা ও জনসেবায় বিমুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাণী স্বর্ণময়ীকে 'মহারাণী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট মহারাণীর উত্তরাধিকারী বংশপরম্পরাসূত্রে "মহারাজা" উপাধি পাইবেন এই ব্যবস্থা করেন। 'মহারাণী' উপাধি দিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া মহামহিমময়ী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণময়ীকে "ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দেন।

স্বর্ণময়ীর সম্মানের লোভ ছিল না। তিনি দশের সেবা করিয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিতেন; কাহাকেও অনুগ্রহ করিতেছি এই অহঙ্কার তাঁহার ছিল না। সেবাই তাঁহার ব্রত ছিল এবং প্রাণপণে তিনি উহা পালন করিতেন।

উইলের মোকদ্দমার সময় হইতে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে মহারাণীর ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। টাকার অনটন পড়িলে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্ণময়ীর কাছে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার করিতেন। বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণ জালে জড়াইয়া পড়িলে মহারাণীর ষ্টেট হইতে ৭৫০০ টাকা ধার করেন। এই উপলক্ষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে তিনি রাজসরকারে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখেন—

"শুভাশিষঃ সন্তু

সাদর সম্ভাষণমাদনম্—

আপনি অবগত আছেন বিধবা বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। ঐ ঋণের টাকা ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই ব্যক্তির নিকট কিছু অধিক ঋণ আছে তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন, এককালে টাকা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেছেন, এককালে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও কোনক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দয়া করিয়া আমাকে ৭৫০০ সাত হাজার পাঁচশত টাকা ধার দেন। একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব। এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই, সন্দেহ থাকিলে কখন আমি

এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহায় ব্যতিরেকে আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না। আমি এত অসম্ভ্রান্ত ও অপদার্থ লোক নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ঋণ করিতেছি অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্ন করিব কিংবা নিশ্চিন্ত থাকিব আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যতদিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে পারি। আপনি না থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারিতাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয় দয়া করিয়া তাহা করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত ও অপদস্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা উচিত হয় তাহা করিবেন। অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে এরূপে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতাম না জানিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পূর্ব্ববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক না। শ্রীমতী আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ঐ সকল উপকার আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি যে তাঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্ব্বাদক অনতি-বিলম্বে তাহার পরিচয় দিব। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি, আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০শে কার্ত্তিক ১২৭৬ সাল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যথাসময়ে এই টাকা পান ও পরিশোধ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর মহারাণীর মন্ত্রণাদাতা, বন্ধু, গুরু রাজীবলোচনের প্রাণবিয়োগ হয়। এমন নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষকে হারাইয়া স্বর্ণময়ীর যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ করা অসম্ভব। রাজীব-লোচন হইতেই তাঁহার সব। তিনি না থাকিলে স্বর্ণময়ীকে পথে দাঁড়াইতে হইত, তাঁহার চিত্তবৃত্তিরও বিকাশ ঘটিত না। রাজীবলোচন নিঃসন্তান ছিলেন। উত্তরাধিকারী বলিতে ছিল ভাগিনেয় শ্যামাদাস। মহারাণী তাহাকে আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। শ্যামাদাসের দেহান্তে মহারাণীর ভগিনীপুত্র শ্রীনাথ বাবু ম্যানেজার ও রাজবাটীর ইঞ্জিনিয়ার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহকারী হন।

সুদীর্ঘকাল সেবাব্রতে তনু, মন ও ধন উৎসর্গ করিয়া ১৩০৪ সালে ১০ই ভাদ্র অশেষকল্যাণকারিণী স্বর্ণময়ী স্বর্গারোহণ করেন। কাশিম-বাজারে "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে"। সমগ্র ভারতের শোকোচ্ছ্বাস তাঁহার সহগামী হয়।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। স্বামীর আত্মহত্যা, বিষয়চ্যুতি, মামলা মোকদ্দমা, অমঙ্গলের কিছু বাকী ছিল না। দুইটী কন্যাও ভগবান তাঁহাকে দিয়াছিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী। একটী রাজা কৃষ্ণনাথ বাঁচিয়া থাকিতেই অকালে ঝরিয়া পড়ে; অন্যটী বিবাহের পর বিধবা জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ভগিনীর অনুসরণ করে। কিন্তু অমঙ্গলের কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকার পথ দিয়াই মঙ্গল আসে এই পরম সত্যের উপলব্ধি তাঁহার ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে। তিনি পথ খুঁজিয়া পান। সেই জন্য আভিজাত্যের গৌরব না থাকিলেও তিনি কর্ম্মবলে চির গৌরবময়ী হইয়া আছেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরী

যে সকল হিন্দুনারী সতীত্ব, ত্যাগ ও চরিত্র মাধুর্য্যে ভারতের ঋষি নির্দ্দিষ্ট আদর্শকে প্রাণময়, গীতিময় করিয়াছেন মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি বালবৈধব্যের চিরকরুণ তাপসী প্রতিমা। শরণাগতদীনার্ত্ত জননী। সারল্যে শিশু, নম্রতায় তৃণ, সহিষ্ণুতায় তরু, ঔদার্য্যে সিন্ধু, করুণায় দেবী, দানে কল্পতরু।

রামপুর বোয়ালিয়ার ৮ ক্রোশ পূর্ব্বে পুঁটিয়া গ্রাম। সেই গ্রামের ধনাঢ্য সান্ন্যাল বংশে ১২৫৬ সালে ২০শে আশ্বিন শরৎসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভৈরবনাথের সংসার ধনে জনে পরিপূর্ণ থাকিলেও কি যেন একটা অপূর্ণতার দুঃখ লাগিয়াই থাকিত। শরৎসুন্দরী আসিয়া সেই দুঃখ দূর করেন। তাঁহার বহু পরে আসে ভৈরবনাথের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীসুন্দরী।

ধনীর দুলালী শরৎসুন্দরীর পাঁচবৎসর বয়সেই মহত্ত্বের পূর্ব্বাভাষ ফুটিয়া উঠে। তিনি প্রাণান্তে কোন দাসদাসীকে কটুকথা বলিতেন না, তা তাহাদের যতই ত্রুটি হৌক। পরের দুঃখ দেখিলে যতক্ষণ না সে দুঃখের প্রতীকার হইত ততক্ষণ তিনি শান্তি পাইতেন না। কন্যার জন্য ভৈরবনাথ কোন কর্ম্মচারীকে কোন দণ্ড দিতে পারিতেন না। একবার একজন পাচকের গুরুতর অপরাধের জন্য ভৈরবনাথ তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। এই কথা শরৎসুন্দরী শুনিয়া ভয়ে ও লজ্জায় পিতাকে কিছু বলিতে না পারিয়া একজন কর্ম্মচারীর নিকট পাঁচ টাকা ধার করিয়া ঐ অপরাধীকে দেন। কর্ম্মচারীর মুখে ভৈরবনাথ কন্যার সহৃদয়তার কথা জানিতে পারিয়া মহা আনন্দিত হন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার

যখন যাঁহা প্রয়োজন শরৎসুন্দরীকে তাহা অসঙ্কোচে জানাইতে বলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভৈরবনাথ একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিলে করুণাময়ী কন্যার করুণকণ্ঠের মিনতিতে তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করেন। ব্রাহ্মণ বেকার সমস্যার দুর্দৈব হইতে বাঁচে।

বালিকারা কত খেলা করে। শরৎসুন্দরীর খেলা ছিল দেবদেবীর পূজা। ভৈরবনাথ পূজা করিতে বসিলে বালিকা তাঁহার নিকটে বসিয়া নিবিষ্টমনে পূজা দেখিতেন এবং পিতার পূজা শেষ হইলে তিনি সেই আসনে বসিয়া পূজার খেলা খেলিতেন। অনুকরণে কোন ত্রুটি ঘটিত না। কেবল নিত্যপূজা নয়, বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব, পূজা পার্ব্বণ যাহা কিছু হইত শরৎসুন্দরী খেলার ছলে তাহাই করিতেন। কন্যার বিনয়, লজ্জা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া ভৈরবনাথ সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। ভৈরবনাথের মাতা পুরোহিতের নিকট নিত্য বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তব শুনিতেন। শরৎসুন্দরী থাকিতেন পিতামহীর নিকটে এবং প্রতিদিন শুনিতে শুনিতে এই বৃহৎ স্তবটীও বালিকা আয়ত্ত করেন। ইহা ছাড়া বারব্রতের কথা, লক্ষ্মীর কথা ও অন্যান্য পূজার মন্ত্র তিনি মাতা দ্রবময়ীর মুখে শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করেন। গৃহসামগ্রী কোথায় ও কেমন করিয়া রাখিলে মানায়, বারব্রত ও পূজার উপকরণ কি ও তাহা কেমন করিয়া সাজাইতে হয়, সে নৈপুণ্য তিনি এই অল্প বয়সেই লাভ করেন।

একবার পিতৃশ্রাদ্ধে ভৈরবনাথ অন্নদানের জন্য একখানি পিতলের থালার ব্যবস্থা করেন। ইহা দেখিয়া শরৎসুন্দরী বলিয়াছিলেন "বাবা, পিতলের থালায় তো আমরা ভাত খাই না, তবে এ থালায় চাল ঘি সব সাজানো হচ্ছে কেন"? বালিকার কথায় ভৈরবনাথ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে কাঁসার থালা আনাইয়া অন্নদান করেন।

শরৎসুন্দরীর চরিত্র গঠনের মূলে ছিলেন দ্রবময়ী। বয়সে গৃহিণী, স্বভাবে লজ্জাশীলা বধূ। স্বামীর সংসারে আমিত্ব বিলাইয়া দিয়া তিনি থাকিতেন গৃহকর্ম্ম, বারব্রত ও সকলের সেবা লইয়া। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিত, দ্রবময়ী কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কথা কহিতেন অল্পই, তাহাও মৃদুস্বরে। কেহ কিছু হারাইয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দোষ দিত দ্রবময়ীর। তিনি সে মিথ্যার প্রতিবাদ করিতেন না; বরং প্রকৃত অপরাধী যে তাঁহার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া তিরস্কারের হাত হইতে বাঁচিয়াছে ইহাতে তিনি স্বস্তি পাইতেন। আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী ও প্রতিবেশীদের কল্যাণ কামনার সঙ্গে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে বৃহৎ করিয়া রাখিত।

১২৬২ সালে বৈশাখ মাসে পুঁটিয়ার বিখ্যাত রাজবংশের পৌণে তিন আনার অংশীদার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ শরৎসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তখন বরের বয়স পনেরো; বধূর পাঁচ বৎসর সাত মাস। শরৎসুন্দরীর কোষ্ঠীতে বালবৈধব্য যোগ থাকায় তাঁহার পিতামহীর ইচ্ছা ছিল না যে এত অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। মানুষের ইচ্ছায় কি আসে যায়।

ভাবী অমঙ্গলের সূচনা দেখা দেয় বিবাহ রাত্রে। যোগেন্দ্র নারায়ণের মাতা রাণী দুর্গাসুন্দরী সামান্য কারণে ভৈরবনাথের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া সেই রাত্রেই বরবধূকে রাজবাটীতে লইয়া যান ও চিরাচরিত প্রথার মূলে কুঠার মারিয়া সেখানেই বাসর শয্যার ব্যবস্থা করেন। এদিকে ভৈরব নাথের উৎসব গৃহে একটা উৎকট বেদনা বাণবিদ্ধ পাখীর মত ছটফট করিতে করিতে রাত্রি পোহায়। প্রভাতে পুত্রবধূর মলিন মুখ দেখিয়া রাণীর করুণার উদ্রেক হয় ও তিনি তৎক্ষণাৎ নব দম্পতিকে ভৈরব ভবনে পাঠাইয়া দেন।

পুঁটিয়ার রাজবংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। উপাধি বাগচি। আদি পুরুষ সাধুরাম। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত বৎসাচার্য্য। তিনি তান্ত্রিক সাধক ও জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। বৎসাচার্য্যের বংশধরেরা বিষয়বিভবে লিপ্ত হইলেও যোগনিষ্ঠ ও আচার পরায়ণ ছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁহাদের "ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত। এই প্রাচীনতম রাজবংশে যোগেন্দ্র নারায়ণ ১২৪৭ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ জন্মলাভ করেন। তিনি জগন্নারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র, হরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র। সুপণ্ডিত জগন্নারায়ণ ঠাকুর বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কাশীতে প্রশস্ত ঘাট ও অতিথিশালা এবং গয়াধামে অতিথিশালা ইঁহার কীর্ত্তি। রাণী ভুবনময়ী ইঁহার সহধর্ম্মিণী।

শৈশবেই যোগেন্দ্র নারায়ণ পিতৃহীন হন। সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে থাকে। বিবাহের অল্পদিন পরে যোগেন্দ্র নারায়ণের মাতৃবিয়োগ ঘটে। বালিকা পুত্রবধূকে কন্যার মত লালন-পালনের বড় সাধ ছিল রাণী দুর্গাসুন্দরীর। মৃত্যু সে সাধ মিটিতে দেয় নাই।

যোগেন্দ্র নারায়ণ রামপুর বোয়ালিয়াতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। জননীর স্বর্গলাভের পর বাড়ীতে কোন অভিভাবিকা না থাকায়, শরৎসুন্দরীকে তিনি রামপুর বোয়ালিয়ায় লইয়া যান। বালিকা বধূর তত্ত্বাবধানের জন্য যোগেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া বিধবা মাতুলানী হরসুন্দরী দেবীকে লইয়া আসিয়া গৃহকর্ত্রী করেন।

যোগেন্দ্র নারায়ণ নিত্য নূতন খেলার সামগ্রী, গহনা, বহুমূল্য সাড়ী কত কি আনিয়া তাঁহার বালিকা-বধূকে দিতেন। শরৎসুন্দরী দুই এক দিন ব্যবহার করিয়া স্বামীর দেওয়া উপহার বিলাইয়া দিতেন। ভোগে তাঁহার আসক্তি ছিল না। ভাল লাগিত দান ধ্যান, দেবসেবা,

অতিথি সেবা। ৬।৭ বৎসরের বালিকার এই উচ্চ ভাবের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ যোগেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার কোন কামনাই অপূর্ণ রাখিতেন না।

বিবাহ যে কি বস্তু এবং যোগেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা শরৎসুন্দরী জানিতেন না। জানিবার বয়সও নয়। কেবল জানিতেন যোগেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার বর। তাঁহাকে দেখিয়া ঘোমটা দিতে হয়, সকলের সম্মুখে তাঁহার সহিত কথা কহিতে নাই। তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিতে হয়। হরসুন্দরী তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যত সতী-কাহিনী বলিয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতেন। শরৎসুন্দরী যত শুনিতেন ততই তাঁহার চিত্তে স্বামীর চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঠিক এই সময়ে তাঁহার ভাগ্যের শনিগ্রহ জাগিয়া উঠিয়া সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করে। রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে যোগেন্দ্র নারায়ণ কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। পুঁটিয়ায় থাকেন শরৎসুন্দরী ও অভিভাবিকা হরসুন্দরী। শরৎসুন্দরীর বয়স তখন ৯ বৎসর। কিন্তু অল্প বয়স হইলে কি হয়, তিনি রাজরাণী। সুতরাং দেবসেবা, অতিথিসেবা, আত্মীয় স্বজনের আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি রাজ-পরিবারের যাবতীয় কাজের ভার পড়ে তাঁহার উপর। ক্ষমতার অপ-প্রয়োগ তিনি কখন করিতেন না। সংসারের কাজে চলিতেন হর-সুন্দরীর মতে, রাজত্বের ব্যাপারে কর্ম্মচারীদের। প্রথামত রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার অভিমত জানিতে আসিলে তিনি নেপথ্যে থাকিয়া রাজবংশের পদ্ধতি ও তাহাদের কি ইচ্ছা জানিয়া লইয়া সমস্যার সমাধান তাহাদের করিতে বলিতেন।

অবকাশের বন্ধে যোগেন্দ্র নারায়ণ বাটী আসিতেন। যে কয় দিন থাকিতেন শরৎসুন্দরীর আনন্দের সীমা থাকিত না। স্বামীর উৎসাহে

তিনি বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ, বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ পত্র নিয়মিত পাঠ তাঁহার জীবনে অভ্যাসে পরিণত হয়। তাঁহার সংস্কৃতের শিক্ষক কুলপুরোহিত। পূজা ও স্তব মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন পুরোহিত, রসগ্রহণ করিতেন কিশোরী রাণী। বিবাহের মন্ত্র শরৎসুন্দরীর হইয়া বলিয়াছিলেন অপরে। তিনি পুরোহিতের নিকট ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইতেন। "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্"—ওগো ধ্রুবতারা, আকাশে তুমি যেমন অচল, অটল, পতির সংসারে আমি যেন তেমনই হই। "অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি"—ওগো বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, তোমার মত আমিও যেন পতির অনুরক্তা হই। ঋষিমন্ত্রের উদাত্তস্বর বড় মধুর লাগিত শরৎসুন্দরীর। তিনি সে মন্ত্রের প্রাণ দিবার চেষ্টা করিতেন।

ওদিকে যোগেন্দ্র নারায়ণ কলিকাতার শিক্ষামন্দিরের বন্দীজীবন সহিতে না পারিয়া কুবন্ধুর পরামর্শে দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছিলেন। নিরীহ প্রকৃতি শরৎসুন্দরী স্বামীর অবনতি দেখিয়া নীরবে কাঁদিতেন। তাঁহার মিনতিভরা প্রাণ ভগবানের চরণে স্বামীর সুমতি প্রার্থনা করিত। কিন্তু যোগেন্দ্র নারায়ণকে তিনি কখন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। অনেকে তাঁহাকে বলিত, "মা, তোমার মাথার উপর কেউ নেই। নিজের ভালমন্দ বোঝবার চেষ্টা কর। একটু কড়া নজর দিলেই যোগীন শোধরাবে।" শরৎসুন্দরী বলিতেন—"ওঁর দোষ নেই মা, দোষ আমার ভাগ্যের।" পথ-ভোলা স্বামীকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে পারে সাধ্বী স্ত্রী। কর্ত্তব্যও তাহাই। কিন্তু সে যুগের রীতিনীতি বিচার করিলে শরৎসুন্দরীকে দোষ দেওয়া যায় না। মনে পড়ে জানকীর কথা। তপোবন দেখাইতে আনিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে বনবাসের দণ্ড শুনাইলে তিনি রামচন্দ্রের নিন্দা না করিয়া

বলিয়াছিলেন—

"পতির্হি দেবতানার্য্যঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।"

"পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, বন্ধু ও গুরু, তাঁহার কাজ আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।" শরৎসুন্দরীও জানিতেন স্বামী দেবতা, পরম গুরু। তাঁহার কাজের দোষগুণ বিচার করা অন্যায়। বিশেষতঃ যোগেন্দ্র নারায়ণের মত স্বদেশপ্রেমিক তেজস্বী স্বামীর।

১২৬৭ সালে বৈশাখ মাসে যোগেন্দ্র নারায়ণ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হিসাবে সাবালক হইয়া বিষয়সম্পত্তি ফিরিয়া পান। বিষয় হাতে আসিতেই বাধে অত্যাচারী নীলকরদের সঙ্গে বিবাদ। তিনি প্রজার স্বার্থরক্ষা করিতে পণ রাখেন আপনার প্রাণ। পণ রক্ষা হয় কিন্তু প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইয়া উঠে। ১২৬৯ সালে ২৯শে বৈশাখ যোগেন্দ্র নারায়ণ রামপুর বোয়ালিয়ায় রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করেন। শ্রান্ত স্বামীর শেষ যাত্রার সময়ে শরৎসুন্দরী ছিলেন পুঁটিয়ায়। তাঁহাকে কেহ রামপুর বোয়ালিয়ায় লইয়া যায় নাই। রুগ্ন স্বামীর সেবা করিবার অধিকার থাকিলেও তিনি সে অনুমতি পান নাই। ব্যাকুল হইলেও লজ্জায় নীরব ছিলেন।

নীলকর দমনে আত্মোৎসর্গ না করিলে যোগেন্দ্র নারায়ণের অকাল-মৃত্যু ঘটিত না। কিন্তু যাহা ঘটিবার কথা নয়, সংসারে তাহাই ঘটে। কেন, কেহ জানে না। যিনি ঘটান তিনি না দেন দেখা, না দেন কোন কৈফিয়ৎ। তেরো বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী বিধবা হন। সম্মুখে দীর্ঘ, বন্ধুর পথ। বন্ধু, সাথী, স্বামী-দেবতা স্বর্গে। অন্তরে বাহিরে নিবিড় অন্ধকার। পথে বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। চলিতেই হইবে। দীর্ঘদিনের শেষে ব্যথাহারীর চরণে ব্যর্থ জীবনের ব্যথার পূজা নিবেদন

করিতে অভাগিনী তরুণী ব্রহ্মচারিণী দুঃখের প্রদীপ জ্বালিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। বৈধব্যের সুকঠোর ব্রত ও সংযমে দিব্যকান্তি। কৃচ্ছ্র সাধনে কষ্ট নাই, শ্রান্তি নাই, লক্ষ্যে ভ্রান্তি নাই। তাঁহার আচার পালনের কঠোরতা ভৈরবনাথ ও দ্রবময়ীকে বেদনা দিত। পিতামাতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার ব্রতপালনের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। একবার একাদশীর দিন শরৎসুন্দরীর প্রবল জ্বর। তেমনই পিপাসা। কন্যার প্রাণের আশঙ্কায় ভৈরবনাথ পুঁটিয়ার পণ্ডিতমণ্ডলীকে বলিয়া কহিয়া এই ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন যে অবস্থা বিশেষে একাদশীতে গঙ্গাজল খাইলে ব্রতভঙ্গ হয় না। শরৎসুন্দরী উহা পড়িয়া ঘৃণায় ফেলিয়া দেন।

যোগেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ পৌনে তিন আনার জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। কারণ রাণী নাবালিকা। শরৎসুন্দরী "হাঁ", "না" কিছুই বলেন নাই। আপনার "স্ত্রীধন" হইতে বারব্রতাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে কুলাইত না। ভৈরবনাথ, রাজকর্ম্মচারী ও রাজ্যের প্রজা কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে বিষয়াশয় পরহস্তগত থাকে। সকলের অনুরোধে শরৎসুন্দরী সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন এবং সদাশয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ১২৭২ সালে তিনি বিষয়সম্পত্তির অধিশ্বরী হন।

এই বৎসর পিতাপুত্রীতে তীর্থভ্রমণে বাহির হন। কাশীতে ১২৭৩ সালে ভৈরবনাথ মহাযাত্রা করেন। প্রবাসেই তাঁহার সংসারের প্রবাস-বাস শেষ হয়। মৃত্যুকে দুয়ার হইতে ফিরাইতে শরৎসুন্দরী চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই কিন্তু সময় হইলে কেহ কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অনুনয়-বিনয়, অশ্রুজল, বিলাপ পান্থশালার কক্ষে বক্ষ পাতিয়া দেয়, মৃত্যু তাহার উপর দিয়া রথ চালাইয়া পান্থকে লইয়া যায়।

তীর্থভ্রমণের শেষ হইতে শরৎসুন্দরীর জীবন-গীতার কর্ম্মযোগ অধ্যায়টী আরম্ভ। তপঃপূত দেহের দিব্যাসনে যৌবনশ্রী ধ্যানমগ্ন। ইন্দ্রজাল রচনা ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাম যোগনিষ্ঠ। কামনা সকলের কল্যাণে অতন্দ্রিত। মৃগতৃষ্ণার স্মৃষ্টি ভুলিয়া বিষয়াশয় "তস্মিন তুষ্টে" মন্ত্রে দীক্ষিত। আর্ত্ত, দুঃস্থ, নিরন্ন, নিরাশ্রয়েরু চক্ষে ফুটিল তাঁহার করুণার মূর্ত্তি; ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেখিলেন জাগ্রত ধর্ম্মনিষ্ঠা-রূপে; প্রজা দেখিল সর্ব্বদুঃখহরা জননী।

জ্ঞাতিরা বিরোধের যে প্রাচীর গড়িয়াছিলেন শরৎসুন্দরী তাহা সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সকলের হাতে মিলনের রাখী বাঁধিয়া দেন। প্রীতির মুক্ত বাতাসে হিংসাদ্বেষের দূষিত বাষ্প নষ্ট হয়। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলের তত্ত্ব লওয়া শরৎসুন্দরী নিত্যকর্ম্মের তালিকাভুক্ত করেন। ফলে দুর্ব্বল দায়াদেরা বাঁচে। এক বংশ, শিরা উপশিরায় একই রক্তের প্রবাহ কিন্তু ভাগ্যসূত্র ছিন্ন হইলেই ভিন্ন গোষ্ঠী। তখন ভাগ্যহীনের সঙ্গে আত্মীয়তা লজ্জার বিষয় হয়। রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণের পরিবারবর্গ ভাগ্যের পাশাখেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া স্বজনের মধ্যে বিজনবাস করিতেন। শরৎসুন্দরী তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইয়া তীর্থবাসের ব্যবস্থা করেন।

শ্বশুরকুলের মান মর্য্যাদা রক্ষা করা বধূর কর্ত্তব্য। পুঁটিয়া রাজবংশের বিবাহ একটা মহাসমারোহের ব্যাপার। এক আনার অংশীদার কুমার গোপালেন্দ্র নারায়ণের বিবাহে কোর্ট অব ওয়ার্ডস যে টাকা মঞ্জুর করেন তাহাতে রাজবংশের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। শরৎসুন্দরী আপনার তহবিল হইতে ছয় হাজার টাকা দিয়া চিরাচরিত প্রথা রক্ষা করেন।

তাঁহার দানের পরিমাণ ছিল না। কর্ম্মচারীরা বাধা দিতেন। তিনি ব্যথা পাইতেন কিন্তু পরাধীন কর্ম্মচারীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

করিয়া ব্যথা দিতেন না। অনুনয়-বিনয়ে কর্ম্মচারীরা তাঁহার দানে বাধা দিলে তিনি গোপনে আপনার তহবিল হইতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।

তাঁহার অন্তঃপুর ছিল যত অনাথা ও বিধবার হাট। ৪০।৫০ জন বারো মাস থাকিত। ইহা ছাড়া যে স্ত্রীলোক ভিক্ষা চাহিতে রাজ অন্তঃপুরে একবার আসিত সে ৩।৪ মাসের পূর্ব্বে আর বাহির হইত না। শরৎসুন্দরী সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাইতেন। তাঁহার স্বপাক হবিষ্যান্ন ব্যবস্থা। আশ্রিতাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহার শয্যা কুশাসন, না হয় কম্বল; তাহাদের দুগ্ধফেননিভ। দেখিলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে তাহারা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে কি ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে। রাণী ও ভিখারিণী উভয়ে সমান। অন্তঃপুর সাম্যবাদের বেদী। অনেক উপদ্রব ও অত্যাচার সহিতে হইত শরৎসুন্দরীকে। সমস্তই তিনি অম্লানবদনে সহিতেন। একবার দুইজন ভিক্ষাপ্রার্থিণী বিধবা পরস্পর ঝগড়া করিয়া শরৎসুন্দরীকে ঝাঁটা মারিতে উদ্যত হয়। পরিচারিকারা সমুচিত দণ্ড দিতে যাইবে এমন সময় শরৎসুন্দরী মিষ্ট কথায় অপরাধিনীদের তুষ্ট করেন।

১২৭৩ সালে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম যতীন্দ্র নারায়ণ। ১২৮১ সালে তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পুত্রের উপনয়ন দেন। ১২৮৩ সালের দিল্লীর দরবারে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অশেষ গুণের পুরস্কারস্বরূপ "মহারাণী" উপাধি দেন। বিধবা বলিয়া তিনি খেলাৎ গ্রহণ করেন নাই। ১২৮৭ সালে যতীন্দ্র নারায়ণের শুভ পরিণয় ঘটে। দুইটী পাত্রী শরৎসুন্দরীর মনোনীত হয় কিন্তু তিনি পুত্রবধূ করেন দুল্লাগ্রামের স্বর্গীয় ভুবনচন্দ্র রায়ের কন্যা হেমন্তকুমারীকে। অন্য পাত্রীটির অন্যত্রে বিবাহ হয়। ব্যয় বহন করেন মহারাণী।

রাজকুমারের বিবাহে রাজবাটীতে প্রায় ৩০০ জন সধবা ও বিধবা সমবেত হয়। উৎসবের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধার রাত্রে উদরাময় হয় এবং দ্বিতল হইতে নীচে নামিতে গিয়া সে সিঁড়িতেই অসামাল হইয়া পড়ে। রাত্রি পোহাইলে তাহার অপকর্ম্ম দেখিয়া সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতে থাকে। শরৎসুন্দরী আপনার হাতে তাহার মল পরিষ্কার করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন।

তাঁহার জীবনের মন্ত্র মহিলাকবির ছন্দোবীণায় ঝঙ্কৃত—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলই দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

তপস্বিনী মহারাণী এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার করুণার অবারিত দুয়ারে জাতিধর্ম্মের কোন বালাই ছিল না। প্রার্থী প্রতারক কি সাধু সে বিচারও তিনি করিতেন না। তিনি দান করিয়া খালাস। শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্যে বিদ্যালাভ করে। তাঁহার সাহায্যের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—যাহাকে একবার সাহায্য করিতেন আজীবন সে তাঁহার করুণায় বঞ্চিত হইত না। কোন বিদ্যার্থী কৃতবিদ্য হইয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে পারে সে ব্যবস্থাও তিনি করিতেন।

রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রাজসাহীর স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। স্কুলটী কলেজে পরিণত হইলে শরৎসুন্দরী ১১ হাজার টাকা ব্যয়ে কলেজ গৃহ, এবং চারিধারে প্রাচীর ও রেলিং নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি পুঁটিয়াতে একটী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। বহু পাঠশালা, ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুল এবং সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া মহারাণী আপনার

বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেন। ইহা ছাড়া, চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ, অসমর্থের চিকিৎসাব্যয় বহন, তীর্থবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যয় ও পরীক্ষার ফির আনুকূল্য, নানাস্থানে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পথ ও বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কে কোথায় উপবাসী আছে, কাহার গৃহে রোগীর ঔষধ পথ্যের অভাব, কে কন্যাদায়গ্রস্ত, কে বিপন্ন অনুসন্ধান করিয়া তিনি উপচিকীর্ষার আহার যোগাইতেন। জনসাধারণের হিতার্থে তিনি পুঁটিয়ায় একটী বিশাল পরিখাও প্রস্তুত করিয়া দেন।

১২৭৮ সালে রাজসাহী জেলায় ভীষণ বন্যায় তিনি মাসাধিককাল সহস্র সহস্র লোককে আশ্রয় ও আহার দেন। গৃহপালিত পশুও তাঁহার করুণায় বঞ্চিত হয় নাই। ১২৮১ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে তিনি কিছুদিন প্রত্যহ ৫০০০ লোককে অন্ন দিতেন। পরে লোক সংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ায় তিনি ৩।৪ মাস কাল অসংখ্য লোককে নগদ টাকা ও আহার্য্য দেন। ইহা ছাড়া ন্যায্য খাজনার অনেক টাকা তিনি মাফ করেন।

বৈষয়িক ব্যাপারে কেহ ঋণ চাহিলে তিনি বিনা-সুদে ঋণ দিতেন। অধমর্ণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে তিনি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন না। মোকদ্দমায় হারিয়া প্রতিবাদী তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি টাকা ছাড়িয়া দিতেন।

তিনি কখনও কোন অজুহাতে প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতেন না। দলিল দেখাইতে না পারিলে সে যে পুরুষানুক্রমে এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে এই প্রমাণই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। একবার তাঁহার কর্ম্মচারীরা দলিল অভাবে একজন ব্রাহ্মণের দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করিলে শরৎসুন্দরী কর্ম্মচারীদের কোন কথা না শুনিয়া ব্রাহ্মণের জমি ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দেন।

১২৯০ সালে আঠার বৎসর রাজ্যপালনের পর মহারাণী শরৎসুন্দরী সাবালক যতীন্দ্র নারায়ণকে রাজ্যভার দিয়া কাশীবাসের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজার কোন কষ্ট ছিল না। ধর্ম্মকর্ম্ম ও জনহিতকর কার্য্যে অজস্র ব্যয় করিলেও তাঁহার সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় লক্ষাধিক টাকা বাড়িয়াছিল। তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি খরিদ করেন। বৈধব্যের পর তিনি দেহকে দেহ মনে করিতেন না। এইজন্য তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সুবিজ্ঞ কবিরাজ ঔষধ দিতেন, শরৎসুন্দরী তাহা লুকাইয়া ফেলিয়া দিতেন। এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ১২৯০ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ তিনি কাশীযাত্রা করেন। যতীন্দ্র নারায়ণ সঙ্গী হইতে চাহিলে তিনি মিষ্টকথায় তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন। হৃতস্বাস্থ্য যতীন্দ্র নারায়ণ শীঘ্রই তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং এই বৎসর ১৮ই ফাল্গুন কাশীধামে শিবত্ব লাভ করেন। কাশীযাত্রার পূর্ব্বে যতীন্দ্র নারায়ণ গোপনে এক উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তির ভার মাতাকে দেন। শরৎসুন্দরী বিষয়াশয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দিবার সঙ্কল্প করেন কিন্তু আত্মীয়স্বজন, এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত প্রতিবাদী হওয়ায় তিনি ত্যক্ত সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন। তবে পুঁটিয়ায় ফিরিয়া না গিয়া সেখানে একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী রাখিয়া কাশী হইতে রাজ্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

১২৯১ সালে বধূরাণীর এক কন্যা হয়। বিধবা বধূমাতা ও পৌত্রীকে আপনার নিকটে রাখিয়া মহারাণী ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া চিঠিপত্র ও সংবাদ পত্র পড়িতেন ও পত্রের উত্তরের ব্যবস্থা করিতেন। তারপর বেলা ১১টা পর্য্যন্ত দীন দুঃখীর প্রার্থনা শুনিতেন ও পূর্ণ করিতেন। ১১টার পর বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ, নিত্য পূজা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন।

বেলা ৩টার সময় সামান্য হবিষ্যান্ন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুরাণ শুনিতেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত জপ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিতেন। বহু বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। প্রত্যহ দুই তিন জন দণ্ডীকে তিনি আপনার হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন।

কাশীবাস করিতে করিতে শরৎসুন্দরী মাতাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন। জ্বালামুখী তীর্থে দ্রবময়ী দেহত্যাগ করেন।

১২৯৩ সালে মহারাণী পুঁটিয়ায় ফিরিয়া আসেন বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে। তখন তাঁহার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। তিনি সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দিবার সঙ্কল্প করিয়া গভর্ণমেণ্টকে উহা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করেন। গভর্ণমেণ্টের আদেশ কতদিনে আসিবে কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু মৃত্যুদিন সন্নিকট বুঝিয়া শরৎ-সুন্দরী কাশীধামে ফিরিয়া যান। ১২৯৩ সালের ২৪শে ফাল্গুন তিনি সংবাদ পান গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত। ২৫শে ফাল্গুন বেলা দুইটার সময় পুণ্যবতী শরৎসুন্দরী ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে মোক্ষলাভ করেন। মুখে দিব্যজ্যোতি। দেখিলে মনে হয় বুঝি রোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে পুণ্যচিতাগ্নিতে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়। দীনদুঃখী, অনাথা, বিদ্যার্থী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলে মাতৃশোকে হাহাকার করিতে থাকে। বাল-বিধবা শরৎসুন্দরী তখন অমৃতলোকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্যভারত যখন প্রতীচ্যের ভোগমন্ত্রে দীক্ষিত তখন জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাণী যে ভাবে হিন্দুনারীর বৈশিষ্ট্য মহিমান্বিত করিয়াছেন তাহা প্রশংসার অতীত। ইংরাজী না জানিলেও তিনি বিদুষী ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরী তাহার প্রমাণ। শিল্পকার্য্যেও তিনি দক্ষা ছিলেন। তবে বৈধব্যের পর

তিনি ঠাকুর দেবতার পুষ্পসজ্জা ভিন্ন অন্য কোন শিল্পে হাত দিতেন না।

বৈধব্যের সুকঠোর ব্রতনিয়ম যখন তিনি গ্রহণ করেন তখন তাঁহার কতই বা বয়স। একটী দিনও তিনি সে নিয়মভঙ্গ করেন নাই। রাজরাণী হইয়া শীতগ্রীষ্ম একখানা মোটা কাপড়ে কাটাইতেন অথচ শাল, বনাত, ভাল ভাল কাপড় বিলাইতেন রাজেন্দ্রাণীর মত।

ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। মন্ত্রণাসভায় বড়োর পার্শ্বে ছোটোর স্থান হইত। তাহারও মতামত দিবার স্বাধীনতা থাকিত। মতদ্বৈধে তিনি যে পক্ষকে সমর্থন করিতেন সেই পক্ষের মত গৃহীত হইত। কেবল গুরুতর বিষয়ের বেলা মতানৈক্যে মহারাণী রাজসাহী কিংবা কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, স্বার্থপরতা পদে পদে তাঁহার উদারতাকে আঘাত করিয়াছে। বঞ্চনা তাঁহার বদান্যতাকে দণ্ড দিয়াছে তত্রাচ তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভগবানের অসীম করুণায় সংশয় করেন নাই। কখনও কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। সংসারে যে আসে সেই যায়। উদয়ের পর অস্ত। আগমনীর পরে বিজয়া। হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ব্রতচারিণী মহারাণী শরৎসুন্দরী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু হিন্দুনারীকে উদ্বুদ্ধ করিতে আপনার গৌরবময় জীবন রাখিয়া গিয়াছেন।

রাণী শঙ্করী

চির-বন্দনার মন্দিরে শ্রদ্ধার পবিত্র আসনে যে সকল হিন্দুনারীর অক্ষয় স্থান, রাণী শঙ্করী তাঁহাদেরই গোষ্ঠী। তিনি বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেবের যোগ্যা পত্নী।

এই সুচরিতার বাল্যজীবনের কথায় অতীত মৌন। 'কথা কও, কথা কও' বলিয়া সাধিলেও সে কোন কিছু বলে না। ইসারায় জানায় এই বাঙলার সুকন্যাটী রাজরাণী হইয়া যে ধর্ম্মনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, দানশীলতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। কবে, কখন, কোথায় এবং কাহার গৃহে তিনি জন্মলাভ করেন সে বৃত্তান্ত অনাবশ্যক।

বাঁশবেড়িয়া গ্রামটী হুগলির নাতিদূরে। ইহা প্রথমে নগণ্য পল্লী ছিল। সমৃদ্ধ জনপদ হয় রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায়। তাঁহার কৌলিক উপাধি চৌধুরী মজুমদার। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। "রাজা মহাশয়" সম্রাট আওরঙ্গজেবের দেওয়া উপাধি। ভাগ্যবান রামেশ্বর ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে এই সম্মান ও বাঁশবেড়িয়ায় বসবাসের জন্য ৪০১ বিঘা নিষ্কর জমি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে লাভ করেন। রাজভক্তি ও কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার। তিনি নানা দেশ হইতে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অন্যান্য বর্ণাশ্রমীকে আনাইয়া বাঁশবেড়িয়ায় বাস করান, জমিদারী রক্ষার জন্য একটী সুবিস্তৃত পরিখা খনন করেন এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য ৪১টী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই সকল চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন কাশী ও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলী। রাজা রামেশ্বরের সময়ে বাঁশবেড়িয়া দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠে।

"পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর।
বিদ্যা বিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বারমাস।"

রাজা রামেশ্বরের প্রধান কীর্ত্তি—বাসুদেব মন্দির। শিল্পনৈপুণ্যে অনুপম এই দেবালয়টী রাজা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র রঘুদেব। তিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। বাহুবলে মারাঠা দস্যুদের পরাজিত করিয়া তিনি বাঁশবেড়িয়ার সীমানা হইতে তাহাদের দূরীভূত করেন। তাঁহার দানশীলতাও প্রশংসার্হ। বাংলার ব্রাহ্মণদের তিনি বহু জমি ব্রহ্মোত্তর দান কয়িয়া তাঁহাদের স্ব-বৃত্তি অনুশীলনের প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করেন। রঘুদেবের পুত্র গোবিন্দদেব। গোবিন্দদেবের পুত্র নৃসিংহদেব। তিনি ১১৪৭ সালে জন্মলাভ করেন। তখন গোবিন্দদেব পরলোকে। বহু বিষয়সম্পত্তি বর্দ্ধমানের রাজার এবং কতকগুলি পরগণা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দখলে। সাবালক হইয়া নৃসিংহদেব বহ কষ্টে নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করেন। তখন রাণী শঙ্করী তাঁহার গৃহলক্ষ্মী; মনোরমা ও মনোবৃত্তির রূপবাণী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দ্যে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিণী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।"

স্ত্রীর সহায় স্বামী, স্বামীর সহায় স্ত্রী। উভয়ে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। সে বাঁধন মুক্তিসাধনার সহজ উপায়। কারণ সাধ্বী স্ত্রী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল। শেষ বর্গ মোক্ষ। প্রথম তিনটী পাইলে চতুর্থটী অনায়াসলভ্য হয়।

শঙ্করীর সকল কাজ ছিল নৃসিংহদেবের প্রীত্যর্থে। স্বামীর প্রাণে ব্যথা লাগে এমন কোন কাজ তিনি কখন করিতেন না। নৃসিংহদেবও

অনুরাগিণী সহধর্ম্মিণীর অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাকে যোগ্য সমাদর দিতেন। তিনি জানিতেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

যেখানে নারী সমাদৃতা সেখানে দেবতারা বাস করেন। যেখানে সে অনাদৃতা সেখানে ক্রিয়া কর্ম্ম সকলই পণ্ড হয়।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবেন। সে কর্ত্তব্যপালনের প্রেরণা দিবে প্রশান্ত প্রেম। ইহাই দাম্পত্য জীবনের বেদান্ত। যেখানে ইহা ঘটে সেখানে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কোন প্রভেদ থাকে না। শঙ্করী ও নৃসিংহদেব ছিলেন এই বেদান্তের সজীব প্রতিরূপ।

বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে নৃসিংহদেব যখন হাল ছাড়িয়া দিতেন তখন হাল ধরিতেন রাণী শঙ্করী। পত্নীর উৎসাহে তাঁহার নিরুৎসাহ চলিয়া যাইত। তিনি নববলে বলীয়ান হইয়া কাজে নামিতেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সয়ম্ভবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সয়ম্ভবা-মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি তিনি স্বপ্নে পান। মন্দিরের একখানি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে—

"আশা চলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ সয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীনৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহ দেবদত্ততঃ॥"

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাজা নৃসিংহদেব ষটচক্র ভেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপনার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া তিনি ১২০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে মৃত্যুপথযাত্রী হন।

স্বর্গগত স্বামীর অসম্পূর্ণ সঙ্কল্প সম্পূর্ণ করিতে রাণী শঙ্করী পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৩৬ শকাব্দায় এই অপূর্ব্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ষটচক্রভেদ প্রণালীতে ইহা গঠিত। ১৩টী চূড়া। মধ্য চূড়া ৩০ হাতেরও অধিক উচ্চ। মধ্য চূড়ার চারিধারে চারিটী করিয়া চূড়া। ঐ চারিটী চূড়ার প্রত্যেকটীর পার্শ্বে দুইটী করিয়া চূড়া। মন্দিরের অভ্যন্তরে সোপানে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীগুলি অভিব্যক্ত। দেবী-মূর্ত্তি—একটী ত্রিকোণযন্ত্রে শম্ভু শয়ান; তাঁহার নাভিপদ্মের উপরে বিকশিত সরসিজে শ্যামবর্ণা হংসেশ্বরী দক্ষিণমুখে বসিয়া। মন্দির গাত্রে লেখা আছে—

শকাব্দে রসবহ্নি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং॥
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতনারদ্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্ম নিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।

পরিকল্পনায় ও স্থাপত্যে সুন্দর দেবালয়ের অভাব ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে নাই। কিন্তু হংসেশ্বরীর মন্দিরের তুলনা হয় না। ইহা পাতিব্রত্যের অনুপম অভিজ্ঞান। ইহার প্রতিষ্ঠা কেবল মন্ত্রোচ্চারণে নয়, সতীর পবিত্র নয়ন-সলিলে। দেখিলে মনে হয় যেন রাণীর স্বামীর অপূর্ণ কামনা পূর্ণ করিবার একাগ্রতা স্বর্গের দিকে চাহিয়া এখনও বলিতেছে—

"দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!

* * * * *

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরুভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই!"

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ধর্ম্মশীলা রাণী জমিদারীর দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার শাসন-তন্ত্রে শোষণ-যন্ত্রের নামগন্ধ ছিল না। পোষণ-

মন্ত্রে কাজ চলিত। সেইজন্য প্রজারা তাঁহার নাম না লইয়া জল গ্রহণ করিত না। তাঁহাকে তাহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, তাঁহাকেই মা বলিয়া জানিত। বিশেষ করিয়া দায়গ্রস্ত। দায়ে পড়িয়া একবার তাঁহার দ্বারস্থ হইলে আর তাহার কোন দুশ্চিন্তা থাকিত না। দোল-লীলার উৎসবে তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের এক সরা করিয়া আবির ও এক সরা করিয়া টাকা দিতেন। পূজা পার্ব্বণে তাঁহারা রাণীর পর্য্যাপ্ত দানশীলতায় কৃতার্থ হইতেন। দীন দুঃখীর তো কথাই নাই। রাণী শঙ্করীর সকল কাজেই ব্রহ্মময়ীর চরণে আত্মসমর্পণের সুর বাজিত। সেইজন্য তিনি যাহা করিতেন তাহাতে কল্যাণের ছবি ফুটিত। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, আচারব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি তিনটীতেই তিনি অভিজ্ঞা ছিলেন। অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছিল নারী হৃদয়ের কোমলতা। তাঁহার হাতে পড়িয়া রাজধর্ম্ম দিব্যশ্রী লাভ করে, ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষার প্রভাবে সমাজ সমুন্নত হয়, শিল্পকলার ঔৎকর্ষ্য বাড়ে।

রাণী শঙ্করী বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র গতায়ু হয়। সংসারের সম্বল বলিতে থাকে তিনটী প্রপৌত্র—পূর্ণেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র। পাছে তাঁহার অবর্ত্তমানে বিষয়সম্পত্তি লইয়া কোন গোলযোগ ঘটে, প্রপৌত্রেরা প্রপিতামহের মত বিড়ম্বনা ভোগ করে এই ভয়ে তিনি সমস্ত সম্পত্তি হংসেশ্বরী দেবীর নামে দেবত্র করিয়া পূর্ণেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও ভূপেন্দ্রকে পুরুষানুক্রমে সেবাইত নিযুক্ত করেন। বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নির্লিপ্তমনে গুরুদত্ত সাধনায় মগ্ন হন। অবশেষে একদিন জগজ্জননী শিবসুন্দরী সদয় হইয়া তাঁহাকে আপনার অভয় কোলে তুলিয়া লন। হংসেশ্বরী মন্দিরে আপনার নামটী রাখিয়া রাণী উপাস্তের নাম করিতে করিতে বিনা-নামের রাজ্যে যাত্রা করেন।

কুমারী রূপমঞ্জরী

কেবল গৃহকর্ম্মেই নয়, বিদ্যাবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যেও ভারতের নারী চিরগৌরবময়ী। সে জ্ঞানদাত্রী সারদা। বৈদিকযুগে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা "বাক্" চণ্ডীর দেবী-সূক্তের কবি। অদিতি, অপালা, যমী প্রভৃতি বিদুষীগণ ঋক্-রচয়িত্রী। উপনিষদ যুগে গার্গী ও মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী। বৌদ্ধযুগে বহু নারী তত্ত্বজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থানীয়া। কাব্যযুগে—জ্যোতিষে খনা এবং গণিতে লীলাবতী সুবিখ্যাতা। ধ্যানমগ্ন অতীতের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া এখনও তাঁহাদের লজ্জানম্র কণ্ঠস্বর ভারতের আকাশে বাতাসে ওতপ্রোত।

স্ত্রীশিক্ষার যাহাকে বলে তিমিরযুগ সেই যুগে অনুমান ১১৮২ সালে বর্দ্ধমান জেলায় কলাইঝুটী গ্রামে বৈষ্ণবদুহিতা রূপমঞ্জরী জন্মলাভ করেন। নিভৃত প্রান্তরের ফুল কখন ফুটিয়া গন্ধ বিলাইয়া জীবনের গান শেষ করে দূর বনানী তাহার কোন সংবাদ পায় না। চিরকুমারী রূপমঞ্জরী এক অখ্যাত পল্লীতে চিকিৎসা ও অধ্যাপনা করিতেন। সেইজন্য বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে তাঁহার নাম বড় একটা কেহ জানে না।

তাঁহার পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। গৃহস্থ। সামান্য যে কয় বিঘা জমিজমা ছিল তাহাতে রাধাগোবিন্দের সেবা ও সংসার চালাইয়া আনন্দে হরিগুণ গানে দিন কাটাইতেন। জীবে দয়া, নামে রুচি, সাধু সেবা—বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ। ভক্ত নারায়ণ দাস সে অঙ্গের কোন হানি ঘটিতে দিতেন না। পত্নী সুধামুখী ছিলেন স্বামীর ছায়া—ধর্ম্মে কর্ম্মে নিত্য সহায়। রূপমঞ্জরী তাঁহাদের একমাত্র সন্তান—"সাত রাজার ধন একটী মাণিক।" শ্রীরাধার অষ্টসখীর মধ্যে

ললিতা একজন। ললিতার সখী অনঙ্গমঞ্জরী। অনঙ্গমঞ্জরীর সখী রূপমঞ্জরী। কন্যাকে ডাকিলে রাধা-চক্রের একজন সহচরীর নাম করা হইবে বলিয়া নারায়ণ দাস কন্যার নাম রূপমঞ্জরী রাখিয়াছিলেন।

নারায়ণ দাস বাংলা লেখাপড়া ভালই জানিতেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার কিছু বুৎপত্তি ছিল। রূপমঞ্জরী ৫।৬ বৎসরের হইলে তিনি কন্যার হাতে খড়ি দেন। পল্লীগ্রাম। কেহ বলিত—"নারান বোষ্টমের কাণ্ড দেখ। মেয়েকে লেখাপড়া শেখান হচ্ছে। বোষ্টম বাবাজীর অত কেন রে বাপু।" কেহ নিরীহ নারায়ণকে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে আসিয়া বেচারীর সময় ও তামাক নষ্ট করিত কিন্তু পিতা একমাত্র পুত্রীর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করেন নাই। যাহারা গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিতে আসিত তাহাদের বলিতেন—"মেয়েটা ধরেছে কি করি বলুন। পড়াশুনা করা তো মন্দ নয়। আর ওর ওই দিকেই ঝোঁক্।"

রূপমঞ্জরীর বিদ্যাশিক্ষায় অসাধারণ অনুরাগ ও মেধা দেখিয়া নারায়ণ দাস তাঁহাকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। পরের কথায় না থাকিলে যাহাদের দিন কাটে না তাহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"মেয়েকে নদের পণ্ডিত না করে' নারাণ ছাড়বে না। কালে কালে কতই দেখব। তবে ও আমাদের বামুন কায়েতের মেয়ে নয় যে ভুগতে হবে। এই যা।"

ব্যাকরণ পড়াইতে গিয়া নারায়ণ দাস বুঝিতে পারিলেন তাঁহার অধ্যাপনার সীমা আছে, কন্যার অধ্যয়ন-স্পৃহার সীমা নাই। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প দিনে ফুরাইয়া গেল কিন্তু রূপমঞ্জরীর ক্ষুধা মিটিল না। মধ্যে মধ্যে সুধামুখী স্বামীর নিকট কন্যার বিবাহের কথা তুলিয়া প্রতিবেশীরা কে কি বলে সেই কথা বলিতেন। নারায়ণ দাস হাসিয়া বলিতেন—"বৈষ্ণব সকলের দাসানুদাস। তাকে অনেক কিছু সইতে

হয়। রূপো যতদিন পড়তে চাইবে তত দিন তাকে পড়াব। আমার এই ইচ্ছে। এখন রাধামাধব যা করান।”

বাহাদুরপুর গ্রামে বদনচন্দ্র তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠী। বহু ছাত্র সেখানে পড়ে। অধ্যাপকের সুযশ আছে। নারায়ণ দাস রূপমঞ্জরীকে এই চতুষ্পাঠীতে পড়াইবার সঙ্কল্প করেন। এই কথা শুনিয়া সুধামুখী পড়েন মহা ভাবনায়—মঞ্জরীকে ছাড়িয়া তিনি থাকিবেন কি করিয়া। কন্যাই কি সেখানে থাকিতে পারিবে! নারায়ণ দাস পত্নীকে বুঝাইয়া দেন—বিবাহ দিলেও কন্যাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইত। সুতরাং এই অজুহাত চলিতে পারে না। শিক্ষার আগ্রহই রূপমঞ্জরীকে প্রবাসবাসের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দিবে। সুধামুখী স্বামীর সঙ্গে কোন দিন বাদ প্রতিবাদ করিতেন না। অগত্যা স্বামীর মতেই মত দেন।

একদিন নারায়ণ দাস বাহাদুরপুর গিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কন্যাকে ভর্ত্তি করিবার কথা তোলেন। বৃদ্ধ অধ্যাপকের অলঙ্কার ছিল গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রশস্ত চিত্ত। ছিল না তর্কের অভ্যাস। তিনি ভাবী ছাত্রীর বিদ্যালাভের আগ্রহের কথা শুনিয়া বিদ্যাদানে সম্মত হন। বলেন—“পড়াতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এখানে মেয়েদের পড়ার কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই। তোমার মেয়ে যদি ভর্ত্তি হয় তাকে ছাত্রদের সঙ্গেই পড়তে হবে। খাওয়াদাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আমার গৃহিণী কর্ব্বেন সে দিকে কোন ভাবনা নেই। এতে যদি রাজী হও মেয়েকে নিয়ে এসো।” নারায়ণ দাস জানিতেন রূপমঞ্জরীর চিত্ত ব্রজবালার মত নির্ম্মল। অধ্যাপককে জানাইলেন পুরুষ ছাত্রের সঙ্গে কন্যার বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

শুভদিন দেখিয়া রূপমঞ্জরী চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি হন। অধ্যয়নের তপস্যা আরম্ভ হয়। সংযম, ত্যাগ, একাগ্রতা, প্রযত্ন ও প্রতিভার

গুণে তিনি অল্প দিনেই অধ্যাপকের স্নেহপাত্রী হন। নবাগতা শিষ্যার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক গৃহিণীও তাঁহাকে মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দেন।

সহপাঠী সকলে কিশোর। কিশোরী রূপমঞ্জরীর প্রথমে কেমন কেমন ঠেকিত। কলাইঝুটীতে কত কিশোরের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছেন, কৈ এমন তো হয় নাই। তাঁহার অনভ্যস্ত জীবনের আড়ষ্টতা মুগ্ধবোধের মধ্যে পরিত্রাণের পথ খুঁজিত। অধ্যাপক বলিতেন—"পড়াশুনায় লজ্জা করতে নেই, মা। এটা বিদ্যাপীঠ—একটা তীর্থ। ওরা সব তোমার ভাই—সতীর্থ।" ছাত্রদের উপদেশ দিতেন রূপমঞ্জরীকে সহোদরার প্রাপ্য স্নেহ দিতে। ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। রূপমঞ্জরী স্বচ্ছন্দে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এক একদিন তাঁহার মন ছুটিয়া পলাইত পিতামাতার নিকট। তাঁহারা এখন কে কি করিতেছেন এবং এখানে না থাকিলে তিনি সেখানে কি কি কাজ করিতেন তাহারই ছায়াচিত্র দেখিতেন। রাধামাধবের পূজার জন্য তিনি নিত্য ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথিয়া দিতেন—পিতা নামকীর্ত্তন করিতে বসিলে তিনি একমনে তাহা শুনিতেন—এখন তাহা বন্ধ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রূপমঞ্জরী পাঠাভ্যাসে মন দিতেন। পড়াশুনা হইলে গুরুপত্নীর কাজে সাহায্য করিতেন। মধ্যে মধ্যে নানা দ্রব্য লইয়া নারায়ণ দাস কন্যাকে দেখিতে আসিতেন। অধ্যাপকের মুখে রূপমঞ্জরীর প্রশংসা ধরিত না। নারায়ণ দাস হৃষ্টমনে বাড়ী ফিরিতেন। সুধামুখী একটী একটী করিয়া কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রশ্ন ফুরাইত না। উত্তর দিতেও নারায়ণ দাস বিরক্তিবোধ করিতেন না। সেদিনটী কাটিত রূপমঞ্জরীর কথায়। চতুষ্পাঠী বন্ধ হইলে রূপমঞ্জরী অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাড়ী আসিতেন। যে কয়দিন থাকিতেন সুধামুখী একটী দণ্ডও তাঁহাকে চোখের আড়াল

করিতেন না। বাল্যসখীরা দেখা করিতে আসিত। প্রতিবেশিনীরা দুইবেলা তত্ত্ব লইতে আসিতেন। বিবাহের কথা উঠিত। নারায়ণ দাস রাধামাধবের ইচ্ছার দোহাই দিয়া সে কথা চাপা দিতেন। মুগ্ধবোধ শেষ করিয়া রূপমঞ্জরী পাণিণি ধরেন। এদিকে বয়স কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পৌঁছায়। যেন ঘুমের দেশ—না আছে কোন সাড়া, না আছে শব্দ। কোন বিক্ষোভও নাই। যখন তাঁহার বয়স ১৬।১৭—তাঁহার পিতৃদেব কণ্ঠে গান লইয়া বৈকুণ্ঠলোকে যাত্রা করেন। রূপমঞ্জরীর তপস্যাই তিনি দেখিয়া গেলেন। বরলাভের দিনটীর জন্য অপেক্ষা করিবার অনুমতি পাইলেন না। বাহাদুরপুরে লোক আসিল রূপমঞ্জরীকে লইতে। পিতার শেষকৃত্য করিতে হইবে। পিতৃবিয়োগের নিদারুণ বেদনা বুকে করিয়া অনূঢ়া তরুণী জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন। অনেক প্রবোধ, অনেক সান্ত্বনা দিলেন সহৃদয় বৃদ্ধ অধ্যাপক। সারা পথ রূপমঞ্জরীর কেবলই মনে হইল পড়াশুনার জন্য প্রবাসে না থাকিলে পিতার শেষ সময়ে সেবা শুশ্রূষা না করিতে পাওয়ার দুঃখভোগ করিতে হইত না।

নারায়ণ দাসের পারলৌকিক কাজ করিয়া রূপমঞ্জরী বাড়ীতেই রহিলেন। পড়াশুনার উৎসাহ কমিয়া গেল। পিতা নাই আর পড়িয়া কি হইবে! আত্মীয় স্বজন সুধামুখীকে বলিলেন যাহা হইবার হইয়াছে মানুষের হাত নাই তাহাতে। প্রধান কাজ বাকী আছে—রূপমঞ্জরীর বিবাহ। সেটা শীঘ্র চুকাইয়া ফেলাই ভাল। সন্ধানে ভাল পাত্র আছে। রূপমঞ্জরী বাঁকিয়া বসিলেন। বলিলেন, তিনি চিরকুমারী থাকিবেন বিবাহের চেষ্টা করা বৃথা। পরচর্চ্চা না করিলে যাহাদের পরিপাক যন্ত্র নিশ্চল থাকে তাহারা রূপমঞ্জরীর সঙ্কল্প লইয়া দুই চারি দিন বেশ আনন্দে কাটাইল। সুধামুখীর বড় সাধ ছিল কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার যাহা কিছু জমি জমা আছে কন্যা জামাতাকে দান করিয়া বৃন্দাবনে বা

করিবেন। তিনি কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তাহাকে বিবাহে রাজী করাইতে পারিলেন না। রূপমঞ্জরী মাতাকে প্রমাণ করিয়া দিলেন পূর্ব্বকালে বহু ঋষিকন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। সুধামুখী বলিলেন—"তুমি তো মা ঋষির মেয়ে নও।" রূপমঞ্জরী বলিলেন—"কেন, আমার বাবা কি ঋষিদের চেয়ে কম ছিলেন না কি।" সুধামুখীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বাল্যসখীরা সকলেই এখন পরিণীতা। মাটীর পুতুল খেলা ছাড়িয়া তাহারা করে সজীব পুতুল লইয়া খেলা। একা রূপমঞ্জরী অবিবাহিতা। দেখা হইলে তাহারা বলিত—"বই নিয়েই কি জন্ম কাটাবি, ভাই? বৌ হয়ে ঘরকন্না কর্। পড়্লি ত অনেক। আর কেন?" রূপমঞ্জরী মৃদু হাসিয়া বলিতেন —"তোরা ভাই বৌ হয়ে জন্ম জন্ম ঘরকন্না কর। তোদের দেখে আমি চক্ষু সার্থক কর্ব্ব।" "তুই ভাই পণ্ডিত লোক—তোর সঙ্গে কথায় কে পার্ব্বে বল্" বলিয়া তাহারা যে যাহার কাজে চলিয়া যাইত।

ব্যাকরণ শেষ করিয়া রূপমঞ্জরীর কাব্য পড়িবার ইচ্ছা ছিল। পিতৃবিয়োগ না ঘটিলে সে ইচ্ছা এতদিন অপূর্ণ থাকিত না। শোকের বেগ মন্দীভূত হইলে ৭।৮ মাস পরে তিনি সর গ্রামে অধ্যাপক গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের টোলে ভর্ত্তি হন। একজন পূর্ণযৌবনা কুমারীকে কাব্য পিপাসু দেখিয়া বৃদ্ধ অধ্যাপক বিস্মিত ও আনন্দিত হন এবং অল্প দিনেই বুঝিতে পারেন তাঁহার অধ্যাপনা পণ্ডশ্রম হইবে না। যে নিজে ভাল জগৎ সংসার তাহার কাছে ভালই ঠেকে। সত্য বটে সংসারে দেবতাও আছেন অসুরও আছে। উভয়ের দ্বন্দ্বেরও বিরাম নাই। কিন্তু সাধু পিতা রূপমঞ্জরীকে চরিত্রগঠনের বৃথা শিক্ষা দেন নাই। তাহারই মাধুর্য্যে রূপমঞ্জরী সমাদর পাইতেন সর্ব্বত্র। ভয়কে ভয় করিলেই সে পাইয়া বসে। রূপমঞ্জরী ভয়কে ভয় করিতেন না। সেইজন্য ভয়

তাঁহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিত না। কাব্যের পর রূপমঞ্জরী চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি দুরূহশাস্ত্র গোকুলানন্দ সযত্নে ছাত্রীকে শিক্ষা দেন। বিদ্যার্জ্জনে রূপমঞ্জরীর কোন দিন আলস্য ও অমনোযোগ ছিল না। ইহার উপর ছিল অসাধারণ প্রতিভা। এই জন্য তাঁহার সাধনা সিদ্ধির সাক্ষাৎ পায়।

শিক্ষা শেষে বিজয়িনী রূপমঞ্জরী অধ্যাপকের আশীর্ব্বাদ ও চিকিৎসা করিবার অনুমতি লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। হায়, পিতা বাঁচিয়া থাকিলে সিদ্ধি আজ কত আনন্দেরই না হইত! বৈকুণ্ঠবাসী স্বামীর চরণোদ্দেশ্যে সুধামুখী হর্ষ বিষাদমাখা অশ্রু অঞ্জলি দেন।

যে বিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা বিতরণ করিতে রূপমঞ্জরী পিতার নামে স্বগ্রামে এক ঔষধালয় খুলিয়া চিকিৎসা ও অধ্যাপনায় ব্রতী হন। নারী কবিরাজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নাড়ীজ্ঞান লইয়া অনেকে অনেক টীকা টিপ্পনী করিয়াছিল কিন্তু রূপমঞ্জরী নিরুৎসাহ হন নাই। ক্রমশঃ দুই একজন করিয়া দরিদ্র রোগী আসিতে থাকে। তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে লইয়া আসে। এমনই করিয়া দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। স্ত্রীলোক আবার চিকিৎসার কি জানে বলিয়া যাহারা তাঁহাকে উপেক্ষা করিত তাহারাও বলিতে লাগিল—"নাঃ, নারাণ দাসের মেয়েটা চিকিৎসা জানে দেখছি। ঠিক ঠিক রোগ ধরে। আরামও করে শীগ্‌গির।" যে রোগ এক সপ্তাহে আরোগ্য হয় তাহার আয়ুষ্কাল অযথা বাড়াইয়া রূপমঞ্জরী রোগীকে কষ্ট দিতেন না। ইহাতে অর্থের দিক দিয়া তাঁহার ক্ষতি হইত কিন্তু রোগীর অভিভাবকেরা দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। ঔষধের মূল্য ছিল নাম মাত্র। অসমর্থের নিকট তাহাও লইতেন না। তাহাদের যত্ন করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেখিতেন। বলিতেন, "যাদের দুপয়সা আছে তাদের চিকিৎসকের

অভাব কি! গরীবেরা নিরুপায়। তাদেরই আগে দেখা দরকার।” তাঁহার সদয় ব্যবহার, সঠিক রোগ নির্ণয়, সুন্দর চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধের গুণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে তাঁহার মাতা সুধামুখীর মৃত্যু ঘটে। আপনার বলিতে ৺রাধামাধব ভিন্ন সংসারে আর কেহ রহিল না। ফলাফল বৃন্দাবনবিহারীর শ্রীচরণে সঁপিয়া রূপমঞ্জরী আপনার কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন। তাঁহার চরক, নিদান প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞান বহু পুরুষ বৈদ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অনেকে তাঁহার নিকট দুরারোগ্য রোগ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আসিতেন। ইঁহাদের মধ্যে মানকর গ্রামের বহুদর্শী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ভোলানাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূপমঞ্জরী যে পরামর্শ দিতেন অমূল্যবোধে পুরুষ-চিকিৎসকেরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার দেহ ছিল নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব। মুণ্ডিত মস্তকে শোভা পাইত শিখা, কণ্ঠে তুলসীর মালা। কোথাও রোগী দেখিতে যাইলে পুরুষের মত চাদর ব্যবহার করিতেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তিনি অবসর যাপন করিতেন। গীতা ও ভাগবত ছিল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। কাব্য রচনাও করিতে পারিতেন। কোন টোল হইতে তিনি কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু দেশের দশজনে তাঁহাকে “বিদ্যালঙ্কার” বলিয়া ডাকিত। ছাত্রেরা জানিত তাঁহার মত বিদ্যা কাহারও নাই। অমন সহজভাবে দুরূহ বিষয়ের মীমাংসাও কেহ করিতে পারে না। বিষয়ী জানিত তিনি জমিদারী ও মহাজনী হিসাবে অত্যন্ত পাকা। বৈষয়িক ব্যাপারে লোকে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিত।

বিদ্যা তাঁহাকে প্রগলভা না করিয়া বিনম্রা করিয়াছিল এবং দিয়াছিল চরিত্রবল, ধর্ম্মে মতি, কর্ম্মে শ্রদ্ধা। তাঁহার পবিত্র জীবন গ্রামবাসীর

আদর্শ ছিল। তাঁহাকে দেখিলে রোগীর যেন অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যাইত।

যখন বয়স ৯২।৯৩ তখন রূপমঞ্জরী তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। এ বয়সে কেহ দূরে যাইতে সাহস করে না। কিন্তু আজীবন ব্রহ্মচর্য্যার ফলে তাঁহার দেহ তখনও বেশ বলিষ্ঠ ছিল। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া ও তীর্থকৃত্য করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর ইষ্ট চিন্তায় কাটাইয়া ১২৮২ সালে ১৫ই পৌষ ১০০ বৎসর বয়সে তিনি ভূলোক ছাড়িয়া গোলকে গমন করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন তাঁহার পোষ্যপুত্র রাধারমণ দাস।

আজীবন নারীত্বের জয়গান গাহিয়া চিরকুমারী রূপমঞ্জরী গান শেষ করিতে অশেষের সভায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদচিহ্নের উপর দিয়া বহু উদয়াস্তের শোভাযাত্রা গিয়াছে। সে চিহ্ন এখন আর দেখা যায় না কিন্তু কলাইঝুটীর অনুপরমাণুতে তাঁহার স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে।

উমাসুন্দরী

সতী দক্ষ প্রজাপতির বড় আদরের কন্যা। রাজনন্দিনী। কিন্তু ঘরণী হন পাগল ভোলানাথের। বরাঙ্গে ছাইভস্ম মাখিয়া, রুদ্রাক্ষমালা গলায় দিয়া, গৈরিক বসন পরিয়া, পাগলের সঙ্গে পাগলিণী সাজিয়া ভূতভাবনের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন।

তপোবন রাজকন্যার স্থান নয়। তবুও রাজগৃহের অপর্য্যাপ্ত বিলাস হেয়জ্ঞান করিয়া সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে সেই তপোবনেই সত্যবানের পদপ্রান্তে আশ্রয় লন।

রামচন্দ্র বনবাসী হইলে সীতাদেবী ছায়ার মত তাঁহার অনুগমন করেন। বনবাসের অশেষ কষ্টের কথা বলিয়া, ভয় দেখাইয়া, নিষেধ করিয়া রাঘব তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। জানকী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি না থাকিলে অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুর আমার নিকট অরণ্য হইতেও ভীষণ হইবে। আমি এক দণ্ড থাকিতে পারিব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার সেবা করিতে পাইলে বনভূমিই আমি রাজগৃহ বলিয়া মনে করিব, পরম আনন্দে থাকিব।"

ভারতের সতী স্ত্রীর প্রকৃতি এমনই। রাজকন্যা নাই, মন্ত্রীকন্যা নাই, সদাগর কন্যা নাই, কোটাল কন্যা নাই, দরিদ্রের কন্যা নাই—সকলেরই এক ধারা। স্বামীর সংসার সুখের হউক আর দুঃখের হউক, স্বামী বনবাসী হউন আর গৃহবাসী হউন তাহাতে পতিব্রতার কিছু আসে যায় না। তৃপ্তিহীন ভোগের কামনা ত্যাগের খড়্গে বলি দিয়া সে পুণ্য প্রেমের প্রভাবে সেই সংসারেই স্বর্গরাজ্য গড়ে। বনবাসেও স্বামী

সামীপ্যে আনন্দ সাগরে ভাসে। সকল দিক দিয়া স্বামীকে সার্থক করিয়া তুলিয়া সে আপনি সার্থক হয়। ইহাই তাহার ব্রত ও সাধনা। স্বামীকে সে জগৎস্বামী জ্ঞানে সেবা করে সর্ব্বস্ব দিয়া। এই সেবাই তাহার জীবনের ষড়্‌দর্শন, বেদ-বেদান্ত। উৎসবের দিনে সে উৎসবময়ী, আনন্দ সরোবরের ফুল্ল কমল। দুঃখের দিনে সে মরমের মরমী, সান্ত্বনার স্নিগ্ধ চন্দন। তাহার স্পর্শমণির কল্যাণে জীবনের যত কিছু অপূর্ণতা হয় পূর্ণ, ক্ষুদ্র পায় রুদ্রতেজ, শূন্যতা ভরিয়া উঠে অমৃত সম্ভারে, তরুতল হয় গীতি-বিতান, ছিন্নকন্থা ও তৃণশয্যা দেয় পরম পরিতৃপ্তি।

তাহাকে বনবাসে দিয়া রামচন্দ্র যজ্ঞ করিতে পান না, স্বর্ণ সীতা গড়াইতে হয়। তাহাকে হারাইয়া মহাযোগী শঙ্কর পাগলের মত বিশ্বময় ঘুরিয়া বেড়ান। কৈলাসের শৈলাবাস অসহ্য হইয়া উঠে।

গৃহে সে গৃহিণী, স্ত্রী, সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বনে সে বনদেবী। সে না থাকিলে গৃহ গৃহ নয়, অরণ্য। সে থাকিলে বন বন নয়, ইন্দ্রালয়।

"চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি' কালের গরিমা!
পাষাণে পাষাণে রেখা তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা!"

কাল সর্ব্বগ্রাসী। কিন্তু পতিব্রতার প্রেম তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করে। এমনই তাহার আশ্চর্য্য শক্তি।

ভারতের ঘরে ঘরে পতিব্রতার জন্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত। কারণ পত্নীত্ব, সতীত্ব ও দেবীত্ব একে তিন, তিনে এক।

পতিব্রতা উমাসুন্দরী ছিলেন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা এবং একজন ততোধিক দরিদ্র পণ্ডিতের পত্নী। সে পণ্ডিত নবদ্বীপের খ্যাতনামা নৈয়ায়িক—রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

রামনাথ যখন বিবাহ করেন তখন তাঁহার ছাত্রজীবন। দরিদ্র কিন্তু স্বাবলম্বী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ও মেধাবী। ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ধর্ম্ম, সত্য, শ্রৌত, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিকতা ব্রাহ্মণের এই লক্ষণগুলি তাঁহার ছিল। সেই জন্য উমাসুন্দরীর দরিদ্র পিতা দরিদ্র ছাত্রটীকে জামাতা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি জানিতেন কন্যার জীবন যে আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে অর্থাভাব তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। পারেও নাই। সমানে সমানে মিলন হইয়াছিল রাজযোটক।

পাঠ শেষে রামনাথ নবদ্বীপের নিকটস্থ বনভূমিতে চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। উপার্জ্জনের চেষ্টায় নয়, যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বিতরণের জন্য। তখন নদীয়ার অধিপতি—মহারাজা শিবচন্দ্র; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র। চাহিলেই রামনাথ রাজসাহায্য পাইতেন; বনে চতুষ্পাঠী খুলিতে হইত না কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণের রাজবৃত্তি গ্রহণের প্রবৃত্তি হয় নাই। লোকে তাঁহাকে "বুনো রামনাথ" বলিত। তবে তাঁহার যে নামই দিক, তিনি যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত সে কথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিত। চতুষ্পাঠীতে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যার্থীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকে। রামনাথের চতুষ্পাঠীতে তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনার এবং উমাসুন্দরীর স্নেহমমতার আকর্ষণে দারিদ্র্যের বিকর্ষণী-শক্তি পরাস্ত হইত। বিদ্যার্থীরা বনেই আসিত বিদ্যালাভে। গুরু নিঃস্ব বলিয়া শিষ্যেরা আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা আপনারাই করিত।

ব্রাহ্মণ চিরদিন ত্যাগী, তপস্বী। সে নিঃস্ব হইয়াও নিঃস্বার্থ, ভিখারী হইয়াও দাতা। যদৃচ্ছালাভেই তাহার পরম সন্তোষ। ঐহিক সুখ-দুঃখের বহু উর্দ্ধে তাহার বাস। রামনাথের সংসারে অস্বাচ্ছল্যই ছিল স্বচ্ছল কিন্তু তিনি থাকিতেন ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে ডুবিয়া।

সে অতলের দুর্গে পাহারা দিত ছাত্র সৈন্য। দৈন্য কিছুই করিতে পারিত না। এদিকে উমাসুন্দরীও তাহাকে গ্রাহ্য করিতেন না। যেন সে তাঁহার পুণ্যাশ্রমের কেহই নয়। তেঁতুল পাতার ঝোল রাঁধিয়া তিনি মেটে পাথরের থালায় আত্ম-ভোলা স্বামীকে অন্ন বাড়িয়া দিতেন। সদা-প্রসন্ন ব্রাহ্মণ তাহাই নারায়ণকে নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিতেন। স্ত্রীলোকের স্বামীই নারায়ণ। সেই স্বামী আবার অন্নভোগ তাঁহার নারায়ণকে নিবেদন করিতেন। সুতরাং উমাসুন্দরী পাইতেন মহাপ্রসাদ। রাজভোগ তাহার তুলনায় কদন্ন। শাঁখা ও লোহা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না বলিয়া নিরাভরণা উমাসুন্দরী হাতে একগাছি লাল সুতা বাঁধিয়া রখিতেন। এয়োস্ত্রীর চিহ্ন। ইহাই তিনি অমূল্য সম্পদ মনে করিতেন।

রাজা মহারাজার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত চতুষ্পাঠী চালাইতেন। রামনাথ ছিলেন আত্ম-নির্ভরশীল। অনুগ্রহ ভিক্ষার ফল আনুগত্য। আনুগত্যের ফল ব্যক্তিত্ব লোপ। এই ভয়ে ব্রাহ্মণ কখন মহারাজা শিবচন্দ্রের দ্বারস্থ হন নাই। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মহারাজার সভায় পৌঁছিয়াছিল। লোকে বন কাটিয়া নগর বসায় এমনই একটা কথা আছে, এই আশ্চর্য্য মানুষটী খুলিয়াছেন চতুষ্পাঠী। সাহায্যের জন্য অর্থী সমৎসুক, কিন্তু প্রত্যর্থীর দেখা নাই। যে রাজবৃত্তি অন্যের একান্ত প্রয়োজন তাহা তাঁহার নিকট একেবারে নিষ্প্রয়োজন। অতএব এই অদ্ভুত প্রকৃতির অধ্যাপককে দেখিবার জন্য মহারাজা শিবচন্দ্র একদিন নৌকাযোগে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। সঙ্গে মহারাণী, দাসদাসী, লোকজন, সিপাই-শাস্ত্রী। নবদ্বীপের অধীশ্বর তাঁহার দর্শন-প্রয়াসী একথা রামনাথ জানিতেন না। ইচ্ছা করিয়াই মহারাজা তাঁহাকে সংবাদ দেন নাই। কিন্তু মহারাজা তাঁহাকে

দেখিবার পূর্ব্বে, মহারাণী পান উমাসুন্দরীর দেখা। গঙ্গার ঘাটেই। উমাসুন্দরী নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। সেদিন তিনি যখন স্নান করিতে আসেন তখন মহারাণীর পরিচারিকাদের স্নান-পর্ব্ব। উমাসুন্দরীর দীন বেশ, 'সোণাদানা' বলিতে দেহের কোথাও কিছু নাই। হাতে একগাছি লাল-সুতা বাঁধা। জলে নামিতেই তাঁহার গায়ের জল একজন পরিচারিকার গায়ে লাগে। রাজকিঙ্করী সহ্য করিবে কেন। রাগিয়া নানা কথা বলে। উমাসুন্দরী অপ্রস্তুত হইয়া বলেন, "মা, আমি ইচ্ছে করে তো জল দিই নি। তা ছাড়া, আমি বামুনের মেয়ে। জল লাগলে কোন ক্ষতি হবে না।" ইহাতে সে আরও রাগিয়া যায়। বলে, "হাতে একগাছা নোয়া জোটে না, সুতো বেঁধে রাখে, আবার বলে কিনা বামুনের মেয়ে, জল লাগলে কোন দোষ নেই! তবু যদি সোয়ামীর সোণাদানা দেবার যুগ্যতা থাকতো।" ক্ষুব্ধা উমাসুন্দরী বলেন, "মা, এই সুতো আছে বলেই নদের মান বজায় আছে। এই সুতো যেদিন ছিঁড়বে নদে অন্ধকার হবে। এই সুতো হাতে নিয়েই যেন মা গঙ্গার কোলে যেতে পারি।" উমাসুন্দরীর শেষের কথাগুলি মহারাণী শুনিতে পান। হাতের সুতা ছিঁড়িলে নবদ্বীপের গৌরবদীপ নিভিয়া যাইবে এমন স্পর্দ্ধা যে রমণী করে তাহার পরিচয় লইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হন। পরিচয় লইয়া তিনি জানিতে পারেন যে এই নারী সেই "বুনো" রামনাথের সহধর্ম্মিনী। যাঁহার জন্য মহারাজার এই জলযাত্রা। পরিচারিকার ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চাহিয়া মহারাণী প্রসন্না উমাসুন্দরীকে বিদায় দেন।

মহারাজা ও মহারাণী যখন চতুষ্পাঠীতে পৌঁছান তখন রামনাথ বিশ্বজগৎ ভুলিয়া শাস্ত্র চিন্তায় মগ্ন। উমাসুন্দরী জানিতে পারিয়া মহারাণীকে সমাদরে ভিতরে লইয়া যান। হাসিতে হাসিতে বলেন,

"তোমরা যে কষ্ট করে আমাদের কুঁড়েতে আসবে তা তো সকালে বল নি, মা।" মহারাণী উত্তরে বলেন, "জানলে পাছে আপনারা ব্যতিব্যস্ত হন এই জন্যে উনি বলতে মানা করেছিলেন। তা, মা, মায়ের কাছে আসব তার আর বলাবলি কি।" বাহিরে মহারাজা দেখিলেন কমলার কৃপাকার্পণ্যের চিহ্ন সর্ব্বত্র পরিস্ফুট কিন্তু নারায়ণের পদচিহ্নও প্রোজ্জ্বল। পবিত্রতা ও শান্তি চতুষ্পাঠীকে তপোবনে পরিণত করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে রামনাথ প্রতিদিনের জগতে নামিয়া আসিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক—মহারাজা শিবচন্দ্র তাঁহার কুটীরে! তিনি শশব্যস্ত ভাবে তাঁহাকে যোগ্য সমাদরে আপ্যায়িত করেন। নানা কথাবার্ত্তার পর মহারাজা প্রকারান্তরে সাংসারিক অভাবের কথা তোলেন। রামনাথ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে জানান যে চিন্তামণি শাস্ত্রখানি চারিখণ্ডই শেষ হইয়াছে। উপস্থিত অন্য কোন অনুপপত্তি নাই। নবদ্বীপাধিপতি তখন আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। সরল ব্রাহ্মণ বলেন—"আপনি সংসারের কি আছে কি নাই জানতে চান? তা, সে আমি তো কিছু জানি না, মহারাজ। আমি জানি পুঁথিপত্রের কথা। আপনি বরং ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করুন।" মহারাজা উমাসুন্দরীর নিকট আসিয়া বলেন—"মা, আমি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের কোন অভাব আছে কি না। তা তিনি বল্লেন—সে কথা আপনি জানেন।" উমাসুন্দরী উত্তর দেন—"সে কথা সত্যি, বাবা। উনি পড়াশুনা, পড়ানো আর পূজো পাঠ নিয়েই থাকেন। সংসারের কোন খপর রাখেন না। সময়ও পান না। তা, কৈ আমাদের কোন অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে না তো! ঘরে চাল আছে। গাছে তেঁতুল পাতা আছে। উনি তেঁতুল পাতার ঝোল ভালবাসেন। ছেলেরা বড় ভাল। রোজ পেড়ে দেয়।

আমি রাঁধি। পরবার কাপড় আছে। শোবার মাদুর আছে। চরকা আছে। সুতো কাটি। ছেলেরা তাঁতিদের কাছে কাপড় বুনিয়ে এনে দেয়।”

সহস্র অভাবের মধ্যে বাস করিয়া স্বাচ্ছল্যের যে তালিকা তিনি দিলেন তাহার উপর কথা চলে না। মহারাজা নির্ব্বাক। মহারাণী অনেক অনুনয় বিনয় করায় ব্রাহ্মণপত্নী হাসিয়া বলেন—“মা, টাকা নেওয়াই নেওয়া নয়। ও তো আজ আছে কাল নেই। কিন্তু এই যে তোমরা দুজনে আমাদের দেখে গেলে, আমাকে মা বলে ডাকলে এই কি কম অনুগ্রহ! কৈ, নেব না বলে তো ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। মনে গাঁথা রৈল চিরদিনের মত। এই ভাল, মা। বিনা-দরকারে কোন কিছু নিতে নেই। যদি কখন দরকার পড়ে তোমাদের বলব।”

এই নির্লোভ, আত্মতৃপ্ত ব্রাহ্মণদম্পতির যে কোন দিন কোন কারণে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য বুঝিয়া মহারাজা ও মহারাণী ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া যান। মহারাণী যতদূর যান যেন শুনিতে পান উমাসুন্দরী বলিতেছেন—“মা, সোয়ামীই আমাদের গয়না-গাঁটী ধনদৌলৎ, যাকিছু। সোণাদানা দিয়ে বাইরেটা ঝাঁপিয়ে রেখে কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ছিলেন জানো তো। তাঁর দুই বিয়ে। বনে যাবার সময় তিনি একদিন তাদের ডেকে বলেন—“ওগো আমি তো বানপ্রস্থ নিচ্ছি। তোমরা কে কি চাও বল। ধনরত্ন যে যা চাও তাকে তাই দেব। তাতে তাঁর মৈত্রেয়ী বলে যে বৌ ছিল সে বলে ‘ওসব নিয়ে কি করব, ঋষি। ওসব কদিনের! দেবে যদি তবে এমন কিছু দাও যাতে চিরদিনের আনন্দ পাই।’ এইতো বামুনের ঘরণীর কথা, মা।”

ভোগবিলাসের মজ্জাগত রোগে যাহারা শ্রীহীন তাহারাই সজ্জা দিয়া সে লজ্জা ঢাকিয়া রাখে। উমাসুন্দরীর সে বালাই ছিল না। মুখে ছিল

স্নেহমমতার স্বাক্ষর; সর্ব্বাঙ্গে পবিত্রতা ও পাতিব্রত্যের দিব্যদীপ্তি। দেখিলে মনে হইত ঋষি-পত্নী। প্রণাম করিতে আগ্রহ হইত। সতীর পদরেণু মাখিয়া দারিদ্র্যের বেণুবনে যেন পারিজাত ফুটিয়া থাকিত। পরমানন্দে রামনাথ শাস্ত্রচিন্তা করিতেন। ছাত্রেরা গুরুপত্নীকে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইত। দৈবাৎ কাহারও রোগ হইলে সে ভাবিত, 'ভয় কি, আমাদের মা আছেন!' সত্যই তাই। উমাসুন্দরী প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিতেন। তাঁহার স্নেহভরা সেবাযত্নে রোগী রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিত। বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর মত আজীবন স্বামীর সেবা করিয়া তিনি সেই বহুগর্ব্বের লাল-সুতা হাতে লইয়াই দিব্যগতি লাভ করেন। পুণ্য-কুটীর শূন্য হয়। গম্ভীর প্রকৃতি রামনাথ গীতার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিতে থাকেন। 'জাতস্যহি ধ্রুবোমৃত্যুঃ'—সত্য কথা কিন্তু বিপত্নীকের অবাধ্য অশ্রু বিন্দু-বিন্দু ঝরিতে থাকে। বিকৃতকণ্ঠে বাহির হয় 'নারায়ণ, তোমারই ইচ্ছা।' ছাত্রেরা 'মা' হারায়।

জননী

নারীত্বের পরম এবং চরম বিকাশ মাতৃত্বে। নারীর সে মহিমোজ্জ্বল করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বজগৎ সম্ভ্রমে চরণে মাথা নত করে। দেবতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মানব ভক্তিভরে বলে—'নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" নারীর এমন গৌরব আর নাই, এমন দায়ীত্বও আর নাই। সন্তানের দেহমনের পুষ্টিসাধনে মা, তাহার কর্ম্ম প্রেরণায় মা, মনুষ্যত্ব বিকাশে মা, বিদ্যাবুদ্ধির সৌকর্য্যে মা, বাহুবলে মা, বিপদে মা, সম্পদে মা। একা মা শত শিক্ষকের সমান। স্তন্যদানেই মাতার কর্ত্তব্য ফুরায় না। আশৈশব সৎশিক্ষা দিয়া সন্তানকে মানুষ করিবার ভার মাতার। জগৎ সভায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী তাঁহাদের অনেকেরই অভ্যুদয়ের মূলাধার চক্রে তপস্বিনী মা অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ'—আকরের মত আকরে পদ্মরাগমণিই ফলে, কাচ নয়। জননীর প্রভাবে সন্তান প্রভাবান্বিত হয়। এইজন্য প্রকৃত 'মা' হইতে হইলে চাই চিত্তের পবিত্রতা, একনিষ্ঠ পতিপ্রেম, ধর্ম্মানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং ত্যাগ।

ঋতধ্বজ রাজার মহিষী মদালসা আপনার পুত্র অলর্ককে ধর্ম্ম এবং রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বীরাঙ্গনা সুভদ্রা এবং রাজরাণী জনা যথাক্রমে অভিমন্যু ও প্রবীরের বীরজননী—এই ক্ষত্রবীর দুই জনের বীরত্বের বিদ্যুৎকেন্দ্র। উত্তানপাদ রাজার অনাদৃতা রাণী সুরুচির শিক্ষায় পাঁচ বৎসরের ধ্রুব গহন বনে কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীহরিকে বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যে টানিয়া আনিয়াছিল।

যুগে যুগে "মা" এমনই করিয়া সন্তানের শ্রেয়লাভের সহায় হইয়া থাকেন। আদর্শ মা না হইলে আদর্শ সন্তান হয় না।

ভগবতী দেবী

বাংলার উজ্জ্বলরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পূতচরিত্রা ভগবতী দেবী তাঁহার জননী। তিনি গো-ঘাট গ্রামের রামকান্ত তর্কবাগীশের কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁহার মাতার নাম গঙ্গাদেবী। পাতুল গ্রামে মাতুলা-লয়। শবসাধনা করিতে গিয়া রামকান্ত উন্মাদ হইয়া যান। এই জন্য ভগবতী দেবীর শৈশবের দিনগুলি মাতুলালয়েই কাটে। অনাদরে নয়, সমাদরে। তাঁহার মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ছিলেন উদারচরিত্র, সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। আদর্শ গৃহাশ্রমী। পূজা, হোম, গীতা-পাঠ, চণ্ডীপাঠ, দেবসেবা, অতিথিসেবা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দুঃস্থের সাহায্য এবং বহু পরিজনের পরিচর্য্যা লইয়া তিনি থাকিতেন। বৃহৎ পরিবারে গোষ্ঠীর আনন্দ ধরিত না। ভগবতী দেবী ইহা নিত্য দেখিতেন এবং আপনার সুখ না খুঁজিয়া অপরকে সুখী করিবার সহজ অথচ শক্ত বিদ্যাটী না জানিয়া একটু একটু করিয়া শিখিতেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার এমনই গুণ! হিংসা, দ্বেষ তিনি জানিতেন না; কাহারও সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া করিতেন না, মুড়ি মুড়কী, মোয়া, মেঠাই যাহা কিছু পাইতেন, এক বয়সের খেলার সাথীদের না দিয়া খাইতেন না। তাহাদের ভিতর নীচজাতীয়া বালিকাও থাকিত। তিনি কোনদিন খেলায় যোগ দিতে না পারিলে তাহাদের খেলায় মন বসিত না। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি কাঁদিয়া সারা হইতেন। দৌহিত্রীকে সন্তুষ্ট করিতে মাতামহ তাহার প্রতীকার করিতেন।

যখন তাঁহার নয় বৎসর বয়স—'নববর্ষা তু রোহিণী,'—তখন মাতামহ অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামের



ভগবতী দেবী।

রামজয়* তর্কভূষণের পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের পৈতৃক ভিটা হুগলী জেলায় বনমালীপুর। তাঁহার পিতা ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের দেহান্তে সামান্য কারণে সহোদরে সহোদরে মনোমালিন্য ঘটায় রামজয় দেশত্যাগী হন। তখন তাঁহার দুই পুত্র, ঠাকুরদাস ও কালিদাস, এবং চারি কন্যা। স্বামী পথের পথিক হইলে দুর্গাদেবী লাঞ্ছনা ও অনাদর সহিতে না পারিয়া পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয় বীরসিংহগ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু এখানেও অশান্তি। পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত অতিবৃদ্ধ; মাতা স্বর্গে। সংসারের কর্ত্তা অগ্রজ রামসুন্দর, কর্ত্রী ভ্রাতৃজায়া। সুতরাং তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় আপনার বাটীর নিকটে দুর্গাদেবীর বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আশ্রয় জুটিল কিন্তু খাওয়া পরার কোন কিনারা হইল না। কষ্টের একশেষ। চরকায় সূতা কাটিয়া সেই সূতা বেচিয়া দুর্গাদেবী কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেন। পুত্রকন্যাদের খাওয়াইয়া কোনদিন তাঁহার দুই বেলা দুই মুঠা জুটিত কোনদিন জুটিত না। বৃদ্ধ উমাপতি সাধ্যমত সাহায্য করিতেন কিন্তু এতগুলি প্রাণীর এত অল্প আয়ে কুলাইত না। জননীর এই নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতে চৌদ্দবৎসর বয়সে ঠাকুরদাস চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতা চলিয়া যান। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ২৩।২৪; মাহিনা মাসে ৮ টাকা। দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা পূর্ব্বের মত নাই। রামজয় গৃহবাসী কিন্তু পথের মায়া প্রবল। বীরসিংহগ্রামে বাস করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু অসহায় স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রতি আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্ব্যবহার তাঁহার বনমালিপুরের পৈতৃক ভিটার মায়াকে মাথা তুলিতে দেয় নাই। অনিচ্ছায় তিনি বীরসিংহ গ্রামে থাকিতে সম্মত হন। ঠাকুরদাসের বিবাহের কিছুদিন পরে উদাসী রামজয় দ্বিতীয়বার পথের ডাকে গৃহত্যাগ করেন।

রূপ এবং ততোধিক গুণ লইয়া ভগবতী দেবী যখন স্বামীর ঘর করিতে আসিলেন তখন সেখানে অপ্রতুলতার প্রবল প্রতাপ। রামজয় কোথায় কেহ জানে না। ঠাকুরদাস কলিকাতায় চাকুরী করেন। মাহিনার টাকা সমস্ত দুর্গাদেবীকে পাঠাইয়া দেন। তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলে। এই অবস্থায় দরিদ্রা শাশুড়ীর পাশে হাসিমুখে দাঁড়াইলেন তরুণী বধূ। যেন মা আর মেয়ে। যে দুর্ব্বহ ভার দুর্গাদেবী একা বহিতেন, যে কষ্ট নীরবে একা ভোগ করিতেন ভগবতী দেবী তাহার ভাগ না লইয়া ছাড়িলেন না। শ্রদ্ধা ও সেবার বিনিময়ে দুর্গাদেবী দিলেন বধূকে হৃদয়ের স্নেহ উজাড় করিয়া। স্নেহযত্নে দেবর ও ননদিনীরা তাঁহার অনুগত হইল; দয়ামায়া ও সৌজন্যে পরিজনেরা গলিয়া গেল, মৈত্রীতে প্রতিবেশীরা বাঁধা পড়িল। গৃহকর্ম্মে আলস্যহারা বধূর নৈপুণ্যের পরিচয়-পত্র লেখা থাকিত। ঠাকুরদাস কলিকাতা হইতে গৃহে আসিয়া দেখিতেন তাঁহাদের লক্ষ্মী-লাঞ্ছিত কুটীরে লক্ষ্মীশ্রী লীলায়িত। যাহাতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকে, সকলে শাশুড়ীর সুখ্যাতি করে সে দিকে বুদ্ধিমতী ভগবতী দেবীর যত্ন এবং চেষ্টা দুইই ছিল। দৈবাৎ কাহারও সঙ্গে দুর্গাদেবীর মনান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে নিরস্ত করিতেন। বলিতেন—"মা, ছেঁড়া কথায় গেরো দিয়ে মন কষাকষি কি ভাল? সকালে উঠেই তো ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে—পাড়াপড়সী। রাগের মুখে কি বলতে কি বলবেন—লোকে আপনার নিন্দে কর্ব্বে। আমাদের কত উপদ্রব সহ্য করেন—আর ওঁদের তুচ্ছ কথায় রাগ কর্ব্বেন?" শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া ভগবতী দেবী অবসর মত প্রতিবেশীদের কত কাজ করিয়া দিতেন। তাহারা বলিত—"বৌয়ের মত বৌ পেয়েছে ঠাকুরদাসের মা। যত রূপ তত গুণ। আবার বুদ্ধিও কি তত।"

দুর্গাদেবী আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারিতেন না; মাসের শেষে দেনা করিতে হইত। প্রত্যেক বিষয়ে ভগবতী দেবীর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তিনি ঘরসংসারের সমস্ত ভার বধূর হাতে তুলিয়া দেন। ইহাতে অস্বচ্ছন্দতার উপদ্রব অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু বধূ বধূই ছিলেন গৃহিণীপণা করিতে গিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি শাশুড়ীঠাকুরাণীর মর্য্যাদা অতিক্রম করে নাই।

অতিথিসেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। অতিথি যখনই আসুক ভগবতী দেবী নারায়ণ জ্ঞানে তাহার সেবা করিতেন। একবার সন্ধ্যার সময় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত। সেদিন রাত্রে শাশুড়ী ও বধূর অনশন এবং ছোটদের অর্দ্ধাশনের ব্যবস্থা। অতিথি সৎকারের বড় দুর্দিন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একে বিদেশী তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাকে অভুক্ত ফিরাইয়া দিলে ধর্ম্ম সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন না অথচ গত্যন্তর নাই। দুর্গাদেবী দেখিলেন ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের দুরবস্থার কথা খুলিয়া না বলিলে চলিবে না। ভগবতী করিলেন নিষেধ। বলিলেন—"মা, আমাদের অবস্থা শুনলে উনি হয়তো এক্ষুণি চলে যাবেন। কিন্তু বিদেশ বিভূঁয়ে ভর্-সন্ধ্যেবেলা ওঁকে না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া তো ভাল হবে না। আপনি ওঁকে হাত পা ধুয়ে জিরুতে বলুন।" দুর্গাদেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কিন্তু ঘরে যে কিচ্ছুটী নেই, মা। ওঁকে কি খেতে দেব?" বধূ উত্তর দিলেন "সে হয়ে যাবে এক রকম করে।" অতএব ব্রাহ্মণ রহিয়া গেলেন। স্বেচ্ছায় ভগবতী দেবী হাতের একগাছি পিতলের "পৈঁছা" খুলিয়া দিলেন এবং দুর্গাদেবী অনিচ্ছায় উহা বন্ধক রাখিয়া অতিথি সেবা করিলেন।

পতিব্রতা ভগবতী দেবীর পুণ্যের পরিপূর্ণতা ঠাকুরদাসের কুটীর-খানিকে অহরহ ছাইয়া থাকিত। এই ভূ-স্বর্গে ১২২৭ সালে ১২ই

আশ্বিন "বীরসিংহের বীরশিশু" ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়া অবধি ভগবতী দেবী উন্মাদ রোগে কষ্ট পান। ঐ সময়ে রামজয় গৃহে ফিরিয়া আসেন। চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। রামজয়ের জ্যোতিষ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ ভবানন্দের গণনায় তিনি জানিতে পারেন বধূমাতার গর্ভে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ আসিয়াছেন। সন্তান প্রসবের পর তিনি নিরাময় হইবেন। চিন্তার কোন কারণ নাই। ঘটিলও তাই। পুত্র জন্মলাভ করিলে ভগবতী দেবীর রোগ সারে। বহুদিন পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া দুর্গাদেবী স্বস্তি পান। প্রতিবেশীরা অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে। ঠাকুরদাস নিরুদ্বিগ্ন হন।

জননীর স্তন্যসুধাই শিশুর জীবন। সেই সুধার সঙ্গে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র গণ্ডুষে গণ্ডুষে পান করিতেন মাতৃ হৃদয়ের সার্ব্বজনীন কারুণ্য, উদারতা এবং পরদুঃখকাতরতা। পাঁচ বৎসর বয়সে সনাতন সরকারের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। সনাতন কড়া পণ্ডিত। তিনি যত না দিতেন পড়া, তাঁহার নেত্র ও বেত্র তত দিত ছাত্রদের পীড়া। একটীতে আতঙ্ক, অন্যটীতে আর্ত্তনাদ। দুর্গাদেবী এবং ভগবতী দেবী সনাতনের কঠোর শাসনপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। রামজয় বলিতেন—"ঠ্যাঙাতো গরু, এখন গুরু হয়ে ছেলে ঠ্যাঙায়। ওর বেশী আর কিছু জানে না।" অগত্যা ঠাকুরদাস কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বগ্রামে লইয়া আসেন এবং একটী পাঠশালা করিয়া দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাপড়ার ভার তাঁহাকেই দেন। আদর দিলে গোপালেরা কৌরব আর শাসন করিলে পাণ্ডব হয় সনাতনের মত এ ধারণা কালীকান্তের ছিল না। এই বেত্রহীন শিক্ষকের স্নেহনেত্রে পড়িয়া প্রতিভাবান ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরে পাঠশালার পাঠ শেষ করেন। এই সময়ে উদরাময় রোগে তিনি কঙ্কালসার হন। বীরসিংহ গ্রামে

ভাল কবিরাজ না থাকায় দুর্গাদেবী ও রামজয়ের অনুমতি লইয়া ভগবতী দেবী পুত্রের চিকিৎসার জন্য পাতুলগ্রাম যান। সেখানে কবিরাজ রামলোচনের সুচিকিৎসা এবং মাতার সুনিপুণ শুশ্রূষায় ছয়মাস পরে ঈশ্বরচন্দ্র নিরাময় হন। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তাঁহারা বীরসিংহ গ্রামে ফিরিয়া আসেন। যে ছয় মাস ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাশায়ী ছিলেন ভগবতী দেবীর আহার নিদ্রা এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। সে যাত্রা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণের আশা ছিল না; কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা ও পুণ্যবতী জননীর অক্লান্ত পরিচর্য্যার গুণে, তিনি রক্ষা পান।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুরন্তপণা করিলে অনেক জনকজননী তাহাদের কঠোর শাস্তি দেন। ভগবতী দেবী কঠোর শাসনের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন—"ছোট ছেলেরা দোষ করেই থাকে—সে তাদের স্বভাব। দোষ গুণের তারা কি জানে। দুরন্তপণা করলে মারধর ভাল নয়। তাতে হিতে বিপরীত হয়। শাসন করতে হয় মুখে, হাতে নয়। কিছুক্ষণ দুষ্টুর সঙ্গে কথা না কইলে সে বুঝবে মা রেগেছে। তখন সে মাকে খুসী কর্ব্বার জন্যে ছটফট কর্ব্বে। তা যদি না করে তবে সে মা, মিছে মা হয়েছে।" বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র বড় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীরা শশঙ্কিত থাকিত। দুরন্তপনা করিলে ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কথা না কহিয়া গম্ভীর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সে কৃত্রিমভাব দেখিয়া অকৃত্রিম অনুতাপে মাতৃভক্ত পুত্র সারা হইতেন; 'মা' 'মা' বলিয়া বালক জননীর পিছনে পিছনে ঘুরিতেন। তাহাতেও জননী কথা না কহিলে—ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিতেন। সন্ধির সময় উপস্থিত বুঝিয়া ভগবতী দেবী প্রসন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া পুত্রকে কৃতকার্য্যের দোষ বুঝাইয়া দিতেন। অপরের অনিষ্ট করিলে যে নিজের অনিষ্ট হয়,

অপরের প্রাণে ব্যথা দিলে সে ব্যথা যে আপনাকে ভোগ করিতে হয় গল্পচ্ছলে এই সব সৎশিক্ষা দিয়া তিনি পুত্রের স্বভাবের গতি ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন।

যে দানশীলতা ও পরোপকারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বলিয়া বিশ্ববিদিত, তাহার দীক্ষা এবং শিক্ষাগুরু তাঁহার করুণাময়ী জননী। পরের দুঃখ দেখিলে ভগবতী দেবী আপনার দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার মাঘ মাসের দারুণ শীতের দিনে ভগবতী দেবী গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন উঠানে কে যেন ডাকিতেছে—"মা, ঘরে আছেন কি।" নারী-কণ্ঠ। তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন দরিদ্রা রমণী শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া। তাহার কাপড়খানি শত তালি দেওয়া—এত ছোট যে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ হয়। শিশুর গায়ে যে ছেঁড়া নেকড়া আছে তাহাতে এই ভীষণ শীতে সে কাঁপিতেছে। ভগবতী দেবীকে দেখিয়া অভাগিনী বলিল—"মা, শীতে এই কচিটাকে নিয়ে মরচি। যদি একখানা পুরাণ ছেঁড়া কাপড় দেন—ছেলেটা গায়ে দিয়ে বাঁচে।" ভগবতী দেবী সজল নয়নে তাড়াতাড়ি আপনার শীতের সম্বল দোলাই খানি ভিখারিণীর হাতে দিয়া বলিলেন—"এই হাড়-কাঁপানো শীতে কাপড়ে কি কর্ব্বে মা, তুমি এই দোলাইখানি নাও।" আশার অতিরিক্ত দান পাইয়া মেয়েটী বলিল—"তোমার ছেলে রাজা হোক মা, মাথার চুলের মত তার পরমায়ু হোক, তার সোণার দোয়াত কলম হোক।"

সে বৎসর ভগবতী দেবী অপরের শীতের কষ্ট ঘুচাইয়া আপনার কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন। যেমন মা তেমনই পুত্র। একবার বালক ঈশ্বরচন্দ্র ভাল কাপড় পরিয়া খেলা করিতে গিয়া দেখিতে পান তাঁহার

খেলার সঙ্গীর কাপড়খানি ছিঁড়িতে কোথাও বাকী নাই। দেখিয়াই তাঁহার মনে পড়ে জননীর কথা—"বাবা, যে খেতে পরতে পায় না, নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়াতে হয়, যার ভাল কাপড় নাই, নিজের ভাল কাপড় তাকে দিতে হয়।" তিনি আপনার ভাল কাপড় খানি সঙ্গীকে দিয়া তাহার ছেঁড়া কাপড়খানি পরিয়া খেলা করিতে থাকেন। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে কাপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া ভগবতী দেবী জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে সন্তান মাতৃস্তন্যের মর্য্যাদা রাখিয়াছে তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"বেশ করেছ, বাবা। খুব খুসী হয়েছি আমি। চরকায় সুতো কেটে আমি তোমাকে আর একখানা ভাল কাপড় তৈরি করে দেব।" মাতার উৎসাহ পাইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের কি আনন্দ! যে কাপড় খানি তিনি খেলার সাথীকে দেন সে খানিও তাঁহার মাতার হাতে কাটা সূতায় তৈরী—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়।"

পুত্রবধূর সেবাযত্নে এবং পৌত্রমায়ায় ভ্রমণপ্রিয় রামজয় গৃহপ্রিয় হইয়াছিলেন। কোথাও বড় একটা যাইতেন না। বয়স ও হইয়াছিল। ১২৩৬ সালে তিনি নারায়ণের নাম করিতে করিতে মহাশূন্যের মহাপথের পথিক হন। বিধবা শাশুড়ী এবং আপনার পুত্রকন্যা লইয়া ভগবতী দেবীর কাজ বাড়ে। কাজে তাঁহার বিরক্তি ছিল না। সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিয়া রাত্রে চরকায় সূতা কাটিতেন। ইহা ছাড়া কোন অসহায় প্রতিবেশীর রোগ হইলে ভগবতী দেবী তাহার সেবা শুশ্রূষাও করিতেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—"ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্য নিয়মিত কার্য্য ছিল।"

যখন কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ, বাড়ীতে লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি, তখন ভগবতী দেবী সাধ মিটাইয়া নিরন্নকে অন্ন দান করিতেন। শত শত অভুক্ত পথিক এই অন্নপূর্ণার কৃপায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। তিনি আত্মীয় পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অভুক্ত লোক দেখিলেই তাহাকে ডাকিয়া বলিতেন —"আহা, আজ বুঝি তোর পেটে কিছু পড়েনি এখনো, মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। আয়, বাবা, দুটী খাবি আয়।"

একবার ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"মা, তোমার আশীর্ব্বাদে এখন তো কিছুরই অভাব নেই। তোমার কি গয়না পরবার সাধ হয় বল—গড়িয়ে এনে আমার সাধ মেটাই।" ভগবতী দেবী উত্তর দেন "গয়না নিয়ে কি হবে, বাবা? আমার শাঁখা নোয়াই তো ঢের। তবে এক কাজ কর। এ গাঁয়ে ছেলেরা যাতে বিনা-মাইনেতে লেখাপড়া করতে পারে এমন একটা বিদ্যালয় করে দে। গরিব লোক বিনা চিকিৎসায় মরে, তাদের জন্যে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। আর যে সব ছেলে বিদ্যালয়ে পড়বে তাদের জন্যে একটা ছত্র খোল্। এই তিনটী করলেই আমার সাধ মিটবে।" মাতৃমন্ত্রের উপাসক ঈশ্বরচন্দ্র জননীর তিনটী শুভ কামনাই পূর্ণ করেন। এই বিদ্যালয়টী পরে তাঁহার জননীর নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ভগবতী দেবী প্রত্যহ ৪।৫ শত লোককে অন্ন দিতেন। অন্ন কষ্ট নিবারণ হইলেও দুঃস্থ গ্রামবাসীকে তিনি মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন।

১২৭৫ সালে চৈত্র মাসে আগুন লাগিয়া বীরসিংহ গ্রামের বাসবাটী পুড়িয়া ছাই হয়। জিনিষপত্র কিছুই রক্ষা পায় নাই—তবে সুখের বিষয় কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র তখন কলিকাতায়

ছিলেন। গৃহদাহের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিবার প্রস্তাব করেন। আর্থিক অবস্থা কলিকাতা বাসের সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু যে সকল নিঃস্ব বালক তাঁহার বাটীতে খাইয়া বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তিনি চলিয়া গেলে তাহাদের কষ্ট হইবে বলিয়া ভগবতী দেবী গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হন নাই।

সেবাধর্ম্ম ছিল বিদ্যাসাগর জননীর প্রাণ। উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, হিন্দু অহিন্দু, সকলেরই মা ছিলেন তিনি। সকলকেই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় মেদিনীপুরের তদানীন্তন ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার হ্যারিসন সাহেবকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে হ্যারিসন সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই সূত্রে ভগবতী দেবী তাঁহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পুত্রের মত আদর আপ্যায়নে অতিথি সৎকার করেন। ক্ষমতাপন্ন অতিথিও তাঁহাকে মাতার সম্মান দেখান। আহারান্তে ভগবতী দেবীর সঙ্গে বাংলায় কথা কহিতে কহিতে সাহেব ধন-সম্পত্তির কথা তোলেন। তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র এবং অপর তিন পুত্রকে দেখাইয়া তিনি আপনার সম্পত্তির সীমা নির্দ্দেশ করেন। বিদায়ের সময় তিনি নবনিযুক্ত কমিশনারকে এই বলিয়া বিদায় দেন যে সাহেবের হাতে যেন দীনদরিদ্রের কোন ক্ষতি না হয়; যেন কার্য্যকাল ফুরাইলে লোকে তাঁহাকে অশ্রুজলে বিদায় দেয়; ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা করে। তাঁহার কথা শুনিয়া হ্যারিসন সাহেব গভীর আনন্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে মা এমন উন্নতহৃদয়া বলিয়াই পুত্র মহামনা। এমন মা পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

বিধবাবিবাহের আন্দোলনে যখন সমগ্র হিন্দুসমাজ ঈশ্বরচন্দ্রের বিপক্ষে তখন উদারহৃদয়া জননীর আশীর্ব্বাদ ছিল তাঁহার রক্ষাকবচ।

অথচ ভগবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। যে সকল স্বজাতীয়া বিধবা পুণভূ্ হইত তাহাদের সহিত তিনি অসঙ্কোচে একত্রে আহারাদি করিতেন। রহস্যচ্ছলে পৌত্র নারায়ণচন্দ্র একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরমা, তুমি এদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া কর। সমাজ তোমাকে 'একঘরে' কর্ব্বে।" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"করে কর্ব্বে। তোর বাবা কত শাস্তর জানে। মন্দ হলে কি সে এ কাজে হাত দিত, না আমিই মত দিতাম।" সন্তানের ভুলভ্রান্তি, অপরাধ স্নেহান্ধ জননী দেখিতে পান না। কিন্তু ভগবতী দেবীর বাৎসল্য তত অন্ধ ছিল না। পদে পদে ঈশ্বরচন্দ্রের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া দয়াময়ী জননী দেশাচার-বিদ্রোহী পুত্রের এই আন্দোলনে কল্যাণেচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পান নাই।

শেষ জীবনে ঠাকুরদাস কাশীবাসী হন। ১২৭৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র ভগবতী দেবীকে কাশী পাঠাইয়া দেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি পশ্চিমের অন্যান্য তীর্থভ্রমণে যান এবং ভ্রমণের শেষে কাশীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু মন দেশের দীনদরিদ্র অনাথের উপর পড়িয়া থাকায় বীরসিংহের অন্নপূর্ণা বীরসিংহে ফিরিয়া আসিয়া দরিদ্রের সেবায় ব্রতী হন। এক বৎসর পরে অসুস্থ স্বামীর সেবা করিতে তিনি পুনরায় কাশী যান। স্বামী নিরাময় হন। কিন্তু ১২৭৮ সালের শেষরাত্রে পুণ্যময়ী ভগবতী দেবীর কলেরা হয় এবং নববর্ষের উৎসবের দিনটীতে পতিব্রতা সতী স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া শিবলোকে চলিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীর জীবনশেষের সংবাদ পান কলিকাতায়।

কন্যা, বধূ, এবং মাতা নারীজীবনের এই তিনটী প্রধান স্তরেই ভগবতী দেবীর মহত্ত্ব উদ্ভাসিত। সত্য বটে তিনি বিদ্যালাভ করেন নাই কিন্তু তাঁহার করুণা, ত্যাগ, উদারতা গৃহিণীপণা, অতিথিসেবা

দানশীলতা, পুত্রপালন, সত্যনিষ্ঠা এবং পতিভক্তি যে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সে বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক পড়িয়া পাওয়া যায় না, ডিপ্লোমাতেও হস্তগত হয় না। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্য্যের ন্যায় আপনার দয়ারশ্মি স্বভাবতঃই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই শলাকার মত কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বন্ধ।" তিনি মহীয়সী ছিলেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র কবির ভাষায়—

"হৃদয় বৈকুণ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর—ঈশ্বর গুরু অমর ঈশ্বর ॥"

সোণামণি দেবী

স্যার গুরুদাসের জননী সোণামণি দেবী লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়-বাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থী কন্যা। জন্ম অনুমান ১২২১ সাল। পিত্রালয়—কলিকাতা শোভাবাজার, নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। বাচস্পতি মহাশয় যজন-যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লইয়া থাকিতেন। অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। পূজা পার্ব্বণ, বার ব্রত, যাগ-যজ্ঞ একটা না একটা লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার বাসভবনে তপোবনের পবিত্রতা ও শান্তি বিরাজ করিত। তখন সাগরিক বস্তুতন্ত্রতার প্রাদুর্ভাব হয় নাই সুতরাং নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ ও স্বধর্ম্মনিরত এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বর্ণগুরুর ভক্তিশ্রদ্ধা দিতে কোন নাগরিকের সম্ভ্রম হানি হইত না।

ব্রাহ্মণবালিকার কর্ত্তব্যগুলি শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সোণামণি পিতামাতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। শৈশবেই তিনি শিক্ষা পান—বিপদ সম্পদ যাহাই আসুক ভগবানের দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইতে হয়, তাহাতে আত্মহারা হইতে নাই। যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয় সেই কাজই কাজ—বাকী অকাজ। করিতে নাই। ধর্ম্মই চিরদিনের সঙ্গী। ভগবান—ভরসা। মানুষের হাতে আছে কাজের ভার ; ফলাফল ভগবানের।

যথাকালে কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সহিত সোণামণি দেবীর শুভবিবাহ হয়। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের নিবাস ছিল ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী বরুগ্রাম। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্র কলিকাতায় গুল ক্যামেল কোম্পানীর আফিসে কাজ করিতেন। তিনিই দেশের বাস উঠাইয়া নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা

রোডে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। রাশ-ভারী রামচন্দ্র ছিলেন কার ঠাকুর কোম্পানীর কর্ম্মচারী। মাহিনা পাইতেন ৫০৲ টাকা মাসে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিতেন। সেই জন্য আফিস আসিতে প্রত্যহ বিলম্ব হইত। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুযোগ্য কর্ম্মচারীর সময়-লঙ্ঘনের অপরাধ কর্ত্তৃপক্ষ দেখিয়াও দেখিতেন না।

কর্ম্মকুশলা, সংবতমনা এবং মিতভাষিণী সোণামণি যখন বধূবেশে রামচন্দ্রের সংসারে দেখা দেন তখন তাহার ভারকেন্দ্রে ঈষৎ চাপ পড়িলেও অপূর্ণতার তাপ কমিয়া যায়। মানসীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে পাইয়া প্রাপ্তি এবং ব্যাপ্তির আনন্দে ধর্ম্মশীল রামচন্দ্রের দিন কাটিত। সোণামণি কাহারও কোন অপ্রিয় কাজ করিতেন না; পরনিন্দা হইতে বিরত থাকিতেন; কখনও অসন্তুষ্ট হইতেন না; শাশুড়ী ও গুরুজনের আদেশ নীরবে পালন করিতেন এবং সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেন। তাঁহার পুণ্যে কেরাণী স্বামীর সংসারে শান্তি এবং শৃঙ্খলা গৃহরক্ষা করিত।

১২৫০ সাল ১৪ই মাঘ বাংলার সুসন্তান গুরুদাস জন্মলাভ করিয়া সোণামণিকে মাতৃত্বের মহোচ্চ আসনে বসাইয়া দেন। রাজা দশরথের মত রামচন্দ্রও আপনার গুরুদেবকে দিয়া পুত্রলাভের জন্য শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া করাইয়াছিলেন। ক্রিয়ার ফল তিনি হাতে হাতে পান কিন্তু সে ফলের পরিণতি দেখিবার অবকাশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। দুই বৎসর দশ মাসের একমাত্র পুত্রকে পিতৃহীন করিয়া তিনি স্বর্গবাসী হন। শিশু পুত্র ও বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া সোণামণি দেবী অকুলপাথারে ভাসিতে থাকেন।

কেরাণী গড়ে যে মাহিনা পায় তাহাতে তাহার ডাহিনে আনিতে বামে কুলায় না। কেবল মাহিনার দিনটীতে সে ক্ষণিকের ধনী।

তারপর পড়ে ঋণ শোধের পালা ও অভাবের জ্বালা। সারাজীবন আধপেটা খাইয়া সারাদিন আফিসে পরিশ্রম করে। মরণের সময় অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাইয়া চিত্রগুপ্তের "হাজিরা বহি"তে নাম সহি করিতে ছোটে। রামচন্দ্রও এই দলের লোক ছিলেন। সুতরাং স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই মহাপ্রস্থান করেন।

দুরবস্থায় পড়িয়া সোণামণি আপনার জন্য বিন্দুমাত্র ভাবিতেন না। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে যে গ্রহণ লাগিয়াছে তাহা পূর্ণগ্রাস ; তাহার মুক্তিস্নান মৃত্যুতে। ইহজন্মের ভাবনা রামচন্দ্রের চিতায় আহুতি দিয়া তিনি দুঃখের তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যত ভাবনা ছিল শিশুপুত্রের জন্য। শ্বশুর বংশের শিবরাত্রির শলিতাটীকে কি করিয়া তিনি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রে পরিণত করিবেন দিবারাত্র ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তা ও অসহায়ের সহায় নারায়ণের নিকট প্রার্থনা। কাল বৈশাখীর প্রলয় নৃত্যে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিলেও তিনি এক মূহুর্ত্তের জন্যও দীনদয়ালের উপর বিশ্বাস হারান নাই।

সংসর্গ চরিত্রের নিয়ামক। সোণামণি শিশু গুরুদাসকে বাহিরে যাহার তাহার সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তবে শিশু-ভোলানাথের দল তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পুত্রের সঙ্গে খেলা করিলে তিনি কিছু বলিতেন না। সঙ্গীর অভাব হইলে মাতা পুত্রে খেলা চলিত। মাতাকে না বলিয়া গুরুদাস কোথাও যাইতেন না। তাঁহার জন্য সোণামণিকে কখন কোন অশান্তি সহিতে হয় নাই। এই বয়স হইতেই মাতৃভক্ত গুরুদাস জননীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন। তাপসী জননীর দেবীভাব তাঁহার মহত্ত্বের পথ সুগম করিয়া দেয়।

একমাত্র সন্তান প্রায়ই গুরুজনের অযথা আদরের আতিশয্যে "গদাধরচন্দ্র" হয়। সে যে-কোন আবদার করে তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ

করিতে তাঁহারা ব্যগ্র হন। এই প্রশ্রয়ের ফলে তাহার অপরিণত বুদ্ধি মন্দের দিকে ছোটে। গুরুদাস "অন্ধের যষ্টী" হইলেও সোণামণির লক্ষ্য-ছিল যাহাতে তাঁহার এই দুর্গতি না ঘটে। তিনি পুত্রকে শিক্ষা দিতেন লোভে পাপ, পাপে তাপ। ব্রাহ্মণের ক্ষমা ও সন্তোষই ধর্ম্ম। সংযমের মত গুণ আর নাই। কিন্তু বালকের স্বভাব যাইবে কোথায়! গুরুদাস জীবনে একটীবার আবদার করিয়াছিলেন। ঘটনাটী তুচ্ছ কিন্তু বুদ্ধিমতী জননী উহা তাচ্ছিল্য না করিয়া যাহাতে এই আবদার স্বভাবে না দাঁড়ায় তাহার ব্যবস্থা করেন। তখন গুরুদাস শিশু, এক বৎসরও হয় নাই পিতৃহীন হইয়াছেন। আমের সময়। প্রত্যহ দুই বেলা আম খাইতে পাইয়াছেন। ১লা আষাঢ় সোণামণি তাঁহাকে আম দেওয়া বন্ধ করেন। গুরুদাসও আম না হইলে ভাত খাইবেন না, সোণামণিও দিবেন না। নিকটেই আর একজন বালক আম দিয়া ভাত খাইতেছে, অথচ তাঁহারই বেলা নিষেধ! চাহিয়া চাহিয়া আম না পাইয়া গুরুদাস কান্না জুড়িয়া দেন। তখন পিতামহী তাঁহার পক্ষে দাঁড়ান। সোণামণি সবিনয়ে তাঁহাকে আম না দিবার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। সুতরাং গুরুদাসকে আম না দিয়াই ভাত খাইতে হয়। বৈকালে সোণামণি তাঁহাকে আম দিলে প্রসন্ন হাসিতে বালকের কচিমুখখানি ভরিয়া যায়। ইহাই তাঁহার সংযম শিক্ষার বর্ণ পরিচয়।

পুত্রের মঙ্গলের জন্য জননীকে সময়ে সময়ে কঠোর হইতে হয়। বাণীর বরপুত্র গুরুদাস হাতে খড়ির পর "ক" লিখিতে গিয়া মহা সমস্যায় পড়েন। কিছুতেই অক্ষরটী আয়ত্ত হয় না। যতবার লেখেন ততবারই খারাপ হয়। একদিন গেল, দুইদিন গেল। তিন দিনের দিন সোণামণি তাঁহাকে বলিলেন যে আজ "ক" লিখিতে না পারিলে তাঁহার ভাগ্যে অন্নজল কিছুই জুটিবে না। গুরুদাস মন দিয়া

লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিতে লিখিতে ১১টা বাজিয়া গেল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শিশু-লেখকের প্রাণ কণ্ঠাগত বলিলেই চলে কিন্তু তখনও "ক"-লেখার কোথায় কি! বেলা ১২টার সময় এত কষ্টের "ক" লেখা শেষ হয় তবে তিনি খাইতে পান। জননীর সুশিক্ষার গুণে গুরুদাস শৈশব হইতেই বিনয়ী, সত্যবাদী, সদালাপী, সদাচারী, অধ্যবসায়ী ও সচ্চরিত্র হন। এই জন্য 'আদর্শ মা' বলিয়া নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে সোণামণি দেবীর সুনাম ছিল। সকলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। দুরন্ত পুত্র কন্যাকে শাসন করিতে না পারিলে মাতারা সোণামণির শরণাপন্ন হইতেন। তিনি স্নেহের শাসনে অশান্ত ও অশিষ্ঠকে শান্ত শিষ্ঠ করিয়া দিতেন।

গুরুদাসের পাঠশালার পড়া শেষ হইলে সোণামণি তাঁহাকে জেনারেল এসেম্ব্লি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। উচ্চশিক্ষা দিবার মত অবস্থা নয় কিন্তু সোণামণির কর্ত্তব্যের তুলাদণ্ডে দারিদ্র্য অপেক্ষা পুত্রের মঙ্গলকামনা ভারী হওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীতা হন। এখানে কিছুদিন পড়িয়া লক্ষ্মীমন্ত মাতুলের ইচ্ছাক্রমে গুরুদাস ওরিয়াণ্টাল সেমিনেরী স্কুলের ছাত্র হন। তাঁহার মাতুল গঙ্গানারায়ণ বাবু ফোর্টে এডজুটেণ্ট জেনারেলের আফিসে হেড এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। মাতুলালয় হইতে গুরুদাস নূতন স্কুলে পড়িতেন। পাছে অগ্রজের সংসারের বিলাসিতার বেষ্টনীতে গুরুদাস লক্ষ্যহারা হন এই জন্য সোণামণি তাঁহাকে বেশীদিন ওরিয়াণ্টাল সেমিনেরী স্কুলে পড়িতে দেন নাই। গঙ্গানারায়ণ বাবু ইহাতে ক্ষুব্ধ হন; অনুযোগও করেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী সত্য কথায় অগ্রজকে তুষ্ট করিয়া গুরুদাসকে হেয়ার স্কুলে পড়িতে পাঠান। নারিকেলডাঙ্গা হইতে গুরুদাস স্কুল যাতায়াত করিতেন। অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাবান বলিয়া শিক্ষকেরা তাঁহাকে স্নেহের

চক্ষে দেখিতেন। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে গুরুদাস জ্বরে পড়েন। ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষের চিকিৎসায় পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া যায়। যে দিন ইংরাজী পরীক্ষা সে দিনও তিনি পথ্য পান নাই। পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য-লাভ গৃহদেবতা রঘুনাথের করুণা বলিয়া জানিলেও উপলক্ষ্য ক্ষেত্রবাবুর নিকট মাতাপুত্র আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। কারণ তিনি না থাকিলে গুরুদাস শয্যাশায়ী থাকিতেন, পরীক্ষা দেওয়া চলিত না। ইহাই ছিল উভয়ের বিশ্বাস। উদ্যমশীল গুরুদাস জননীর আশীর্ব্বাদে একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় স্থানটী পাইতেন সতীর্থ বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—কাশ্মীর রাজ্যের রাজস্ব-সচিব। দুইজনে বরাবর এই প্রতিযোগিতা চলিত। জয়-পরাজয়ের শেষ পালা হয় আইন পরীক্ষায়। ইহাতে প্রথম হইলে সোণার পদক। বন্ধুদের উৎসাহে তরুণ গুরুদাস এই পদকটী যাহাতে নীলাম্বরবাবু না পান তাহার জন্য প্রাণপণে খাটিতে আরম্ভ করেন। দিবারাত্র পড়া আর পড়া। ছাত্রে ছাত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা চিরদিন চলে। ইহা ঈর্ষা নয়, দোষেরও নয়। কিন্তু পুত্রের অত্যধিক পরিশ্রমের উদ্দেশ্য সোণামণির ন্যায়-বুদ্ধির সূক্ষ্ম-বিচারে অন্যায় প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি তাঁহাকে নিরস্ত করেন। মাতার কথায় গুরুদাস রাত্রি জাগিয়া পড়া ও পদকের লোভ ছাড়িয়া দেন কিন্তু পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান ও সোণার পদকটী তাঁহাকে ছাড়ে নাই। এই উপলক্ষে জননীর উপদেশ চিরদিন তাঁহার মনে ছিল। সোণামণি বলিয়াছিলেন "পৃথিবীতে যা কিছু ভাল আমারই হোক, আর যেন কেউ না পায়, এই চিন্তা যে করে তার কখন ভাল হয় না।

স্বার্থত্যাগই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তুমি বরাবর ভাল করে পাশ করে জলপানি ও পদক পেয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। এবারের পদকটী নীলাম্বর পেলেই আমি খুসী হব। তোমার রাত জেগে পড়া কেবল তাকে হারানোর জন্যে। ওরকম পড়া করে কাজ নেই।” উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, প্রদীপের তৈলের মাত্রা কমাইয়া দিয়াছিলেন। কথায় কথায় সোণামণি গুরুদাসকে বলিতেন—“কাজ করতে এসেছ, মুখ বুজে কাজ কর। ফলের লোভ কোরো না। ফলের মালিক নারায়ণ। তবে দেখো তোমার কাজে কারো যেন কোন ক্ষতি না হয়।”

দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। সোণামণি সে জ্বালা সহিতেন নীরবে। তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া লোকে অবাক হইত। তিনি প্রত্যহ দিনের শেষে সারাদিনের কাজের দোষগুণ বিচার করিতেন, ভুল ক্রমে কোন অন্যায় করিলে তাহার সংশোধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বাটীতে একটী কাগজী লেবুর গাছ ছিল। যে চাহিত তাহাকেই তিনি লেবু দিতেন। একদিন এক জন মুটে কাঠ দিতে আসিয়া তাঁহার নিকট একটী লেবু চায়। তখন তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। মুটেকে লেবু না দিয়া ফিরাইয়া দেন। সে তাহার মোটের পয়সা লইয়া চলিয়া গেলে তাঁহার অনুশোচনা আরম্ভ হয়। সকলেই লেবু পায়, কেন তাহাকে দিলাম না এই আত্মগ্লানি তাঁহার কিছুতেই যায় না। গুরুদাস তখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। অবশেষে তিনি ঐ মুটেকে খুঁজিয়া বাহির করেন। সে আসিলে সোণামণি তাহাকে লেবু ও জলখাবার দিয়া নিমিষের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

মহামনা জননীর মহোচ্চ নীতি ছিল গুরুদাসের পথের আলো, জীবন যুদ্ধের বর্ম্ম, কর্ম্মের সঙ্গীত। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা তাঁহার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজ

হইয়াও তিনি যে ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা, পূজাহ্নিক, ব্রতোপবাস তিনি নিয়মিত করিতেন। একবার তাঁহার নিয়মভঙ্গ হয়। ডাক্তার ক্ষেত্রনাথের বাটীতে সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ। জননীর অনুমতি লইয়া গুরুদাস পূজা দেখিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তখনও তাঁহার দেখা নাই। সোণামণি উৎকণ্ঠায় সারা। গুরুদাসও বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত কিন্তু ডাক্তার বাবু তাঁহাকে আসিতে দিবেন না। গুরুদাস বাধ্য হইয়া রাত্রি ৮ টার পর বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তখন সোণামণির প্রতীক্ষা ধৈর্য্যের শেষ সীমায়। তিনি সন্ধ্যাহ্নিকের সময় বহিয়া গিয়াছে বলিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নিজের উৎকণ্ঠার কথাটা গোপন রহিল। গুরুদাস সে কথা জানিতেন। তিরস্কার শেষ হইলে তিনি বলিলেন—"আমি তো আসছিলাম, মা, ডাক্তার বাবু যে আসতে দিলেন না। বল্লেন—আরতি না দেখে যেতে পাবে না। একটা দিন না হয় একটু দেরীই হোল।" সোণামণি বলিলেন—"তুই কেন বলিস নি যে দেরী হলে মা রাগ কর্ব্বেন।" মৃদুভাষী গুরুদাস বলিলেন—"তুমি রাগ কর্ব্বে এ কথা কি আমি সেখানে বলতে পারি।" উত্তর শুনিয়া জননী আনন্দে নিরুত্তর হন।

আইন পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে গুরুদাস জেনারেল এসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউশনে ৪।৫ মাস গণিতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। সোণামণি আপত্তি করেন নাই। এই অস্থায়ী অধ্যাপনার পর তিনি পাটনা কলেজের অধ্যাপক ও গৌহাটী উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকের পদ প্রার্থী হন। পাটনার বেতন ২০০ টাকা। গৌহাটীর ৩০০ টাকা। কিন্তু জননীর মত না হওয়ায় গুরুদাস আর অগ্রসর হন নাই। ইহার কিছু দিন পরে বহরমপুর কলেজে গণিত অধ্যাপক রমানাথ নন্দীর মৃত্যুতে ঐ

পদ খালি হয় এবং গুরুদাসের আবেদন মঞ্জুর হয়। মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। ইহা ছাড়া ওকালতী করাও চলিবে। সোণামণি গুরুদাসকে বলিলেন—"একজনের স্ত্রী-পুত্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে আসবে আর তুমি গিয়ে হাসতে হাসতে তার জায়গায় বসবে, না—অমন চাকরীতে কাজ নেই।" অগ্রজ গঙ্গানারায়ণ আসিয়া বুঝাইলেন যে গুরুদাস না লইলেও ঐ পদ খালি থাকিবে না। একজন না একজন অধ্যাপক হইবেই। সুতরাং গুরুদাসের এই চাকরী লওয়া দোযাবহ নয়। অগত্যা তিনি মত দেন কিন্তু এই সর্ত্তে যে মাসে ১০০ টাকার আয় হয় এমন টাকা জমিলেই নারিকেলডাঙ্গায় আসিতে হইবে। নির্লোভ মাতার ধারণা ছিল ১০০ টাকাই সংসারের পক্ষে যথেষ্ট।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস বহরমপুর যাত্রা করেন। তখন তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছে। নাম মোহিনী। বহরমপুরে গিয়া গুরুদাস প্রথমে তাঁহার মাতুলের বন্ধু রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের গৃহে কিছুদিন থাকেন। তাঁহার আত্মীয় প্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়া সোণামণির ভাবনার অন্ত ছিল না। বলিতেন—"অর্থই অনর্থের গোড়া। দেখ না, পয়সার জন্যে গুরুদাস এক জায়গায়, আমরা এক জায়গায়। যখন পয়সা ছিল না তখন বেশ ছিলাম।" শেষে গুরুদাস মাতা এবং স্ত্রী-কন্যাকে বহরমপুর লইয়া যান। সেখানে গিয়াই তাঁহার কন্যা মোহিনী কলেরায় গতায়ু হয়। পৌত্রীর শোকে সোণামণি অধীর হইয়া পড়েন। মাতাকে অধীর দেখিয়া পুত্রও ধৈর্য্যহারা হন। প্রবীণ উকিল উদার মতিবাবু গুরুদাসকে অনেক প্রবোধ দিয়া শান্ত করেন। মতিবাবুর বন্ধুত্ব তাঁহার কর্ম্মজীবনের সোণার কাঠি ছিল। বহরমপুর সোণামণির ভাল লাগিত না। তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত নারিকেলডাঙ্গায় শ্বশুরের ভিটায়, হিন্দু-সতীর

মহাতীর্থে। গুরুদাসকে তিনি প্রায়ই বলিতেন "বেশী টাকার দরকার নেই। সামান্য কিছু করে নিয়ে বাড়ী চল্, বাবা। ভিটায় থেকে দুঃখ পাই সেও ভাল এখানের ঐশ্বর্য্যে কাজ নেই।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সোণামণির প্রথম পৌত্র হারাণচন্দ্র ভূমিষ্ট হন। ঐ সময়ে গুরুদাস মুর্শিদাবাদের নবাবনাজিমের আইন উপদেষ্টা। একাদশে বৃহস্পতি। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গুরুদাসের দ্বিতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র জন্মলাভ করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে গুরুদাস জননীকে লইয়া কাশী যাত্রা করেন। সেখানে সোণামণি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া পুরাণ পাঠ করান। পরে বহরমপুরে ফিরিয়া যান।

বহরমপুরে বাস জননীর অভিপ্রেত নয় বলিয়া গুরুদাস ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিপুল খ্যাতি ও উপার্জ্জনের মোহ কাটাইয়া নারিকেলডাঙ্গায় ফিরিয়া আসেন এবং এই বৎসরের শেষার্দ্ধে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। জননীর আশীর্ব্বাদে অল্পদিনেই তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণ্য হন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস হাইকোর্টের বিচারপতি হন। মাতৃ আজ্ঞা পালনের শুভফল এতদিনে ফলিল। তাঁহার বহরমপুর ত্যাগ যাঁহারা অবিবেচনার কাজ মনে করিতেন তাঁহারাও বলিলেন জননীর কথা শুনিয়া পুত্র সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। চারিদিক হইতে অভিনন্দন আসিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সে কলরবে যোগ দিলেন না যোগেশ্বরী সোণামণি। পুত্রকে তিনি বলিলেন "বাবা, যে গুরুভার তোমার মাথায় চাপলো আমি ভাবছি তুমি বইবে কি করে। কত লোকের যে মরণ বাঁচন, ক্ষতি লাভ, শুভাশুভ তোমার ওপর নির্ভর করবে তার ঠিকানা নাই। এতদিন স্বাধীন ছিলে, এইবার ভয়ানক পরাধীন

হ'লে। ভয় হয় পাছে তুমি সত্য মিথ্যা ঠিক করতে না পেরে কি করতে কি করে ফেল। যাক্ সর্ব্বদা ভগবানকে ডেকো। তিনিই সত্য-মিথ্যা বুঝিয়ে দেবেন।" মঙ্গলময়ী জননীর এই অহেতুক আশঙ্কা ও উদ্বেগ সন্তানের বিচারবুদ্ধিকে কর্ত্তব্য পালনে প্রবুদ্ধ করে। স্যার গুরুদাসের ন্যায়বিচার, শিষ্টাচার এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাহার সাক্ষী।

জজিয়তী লাভের পর বহু বন্ধু-বান্ধব স্যার গুরুদাসকে সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ অফিসার ও সাহেব পল্লী চৌরঙ্গীতে থাকিবার যুক্তি দেন। কিন্তু তীর্থতুল্য বাস্তভিটা এবং পরিচিত প্রিয় পল্লী ছাড়িয়া তুচ্ছ প্রেস্‌টিজের লোভে অপরিচিত চৌরঙ্গীতে বাস করিতে মাতা পুত্র কেহই সম্মত হন নাই। নারিকেলডাঙ্গার পল্লীসমাজে উভয়ের শ্রদ্ধা সমাদরের সীমা ছিল না। তাঁহারা প্রতিবেশীদের ঘরের লোক ছিলেন। আপদে বিপদে উৎসবে সকলে তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতেন এবং ঘরের লোকের মতই মাতাপুত্র তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। একবার এক প্রতিবেশিনী পুরোহিতবিভ্রাটে পড়িয়া সোণামণির শরণাগত হন। বলেন "মা, পুরুত ঠাকুর আসেন নি, আমার গৃহদেবতার এখনও পূজো হয় নি। ঠাকুর বুঝি আজ উপবাসী থাকেন।" তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া দয়াময়ী সোণামণি বলেন "ভেবো না, মা। ঠাকুর উপবাসী থাকবেন না। অন্য ব্রাহ্মণ না পাও, আমার ছেলে তোমার ঠাকুর পূজো করে দেবে।" ঘটনাক্রমে সেদিন অন্য ব্রাহ্মণ দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। তখন জননীর আজ্ঞায় হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারী স্যার গুরুদাস প্রতিবেশিনীর গৃহে গিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে গামছায় নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিয়া জননীর হাতে দেন। বাংলার উজ্জ্বলতম রত্নকে পুরোহিত বেশে দেখিয়া নারিকেলডাঙ্গা মুগ্ধ হয়! সোণামণির চক্ষে অশ্রুর আকারে আনন্দ

ঝরিতে থাকে। তিনি বলেন "রঘুনাথ, তুমিই ধন্য। যত দিয়েছ দুঃখ তত দিলে আজ আনন্দ। তোমার দয়ার অন্ত নাই। তা না হলে কি আমি এমন ছেলে পেতাম।" ধর্ম্মবলের মত বল নাই। এই বল ছিল বলিয়াই অসহায়া সোণামণি কঠোর জীবনসংগ্রামে বিজয়িনী হন এবং তাঁহার পুণ্য প্রভাবে পুত্র যশোমুকুট পরিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করেন।

জীবনের সায়াহ্নবেলায় সোণামণি বিশ্রামের অবসর পান। ধর্ম্মের সংসারে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ভক্তিসূত্রে বাঁধা। আত্মীয় পরিজন এবং সন্তানসন্ততিতে গৃহ পূর্ণ। সোণামণির বহু পৌত্র পৌত্রী। তিনি কেবল সর্ব্বময়ী কর্ত্রী নন, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার পৌত্র পৌত্রী এবং শিশুদের—হাইকোর্ট। তাহারা দুরন্তপণা করিয়া শাস্তি পাইলে তাঁহার নিকট নালিশ রুজু করিয়া দিত। বিচারকর্ত্রী রায় দিয়া বলিতেন—

"ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,
নিজের ক্ষতি নিজে করে।"

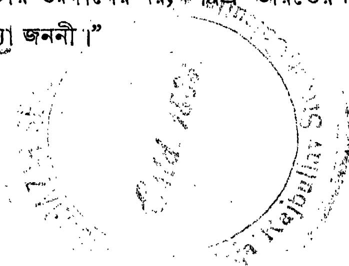
পৌত্রবধূ কিম্বা অন্য কাহারও পুত্রকন্যাকে "মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব" এ কথা বলিবার উপায় ছিল না। দৈবাৎ বলিলে সোণামণি বলিতেন—"মিছে কথা বল কেন বাছা। বলি, হাড় তো সত্যই গুঁড়ো কর্ব্বে না। লাভের মধ্যে ছেলেরা মিছে কথা বলতে শিখবে। শাসন করতে গিয়ে উল্টোছিরি হবে। মারধর করলে ছেলে জব্দ হয় না। ওরা জব্দ কেবল মিষ্টি কথায়। ভাল ব্যাভারে।"

গীতা সোণামণির বড় প্রিয় ছিল। নিত্য বৈকালে গীতা পাঠ করিতেন হারাণচন্দ্র এবং প্রিয় পৌত্রের নিকটে বসিয়া প্রবীণা পিতামহী সেই অমৃত পান করিতেন। হারাণচন্দ্র শ্লোকের সরল ব্যাখা করিয়া সোণামণিকে মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন। একবার কথায় কথায় হারাণচন্দ্র

বলিয়াছিলেন—"আচ্ছা, ঠাকুরমা, তুমি গীতা শোন কেন? তুমি যে নিজেই গীতা।" পৌত্রের কথা শুনিয়া অপ্রতিভ পিতামহী ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ছি, দাদা, অমন কথা কি বলতে আছে! দেবতা দেবতা—মানুষ মানুষ। যোগী ঋষিরা যাঁর জন্য কত তপস্যা করেন, আমি একজন সামান্য মেয়েমানুষ হয়ে বিনা তপস্যায় সেই জিনিষ পাবো। যা বলেছ বলেছ, আর কখন মুখে এনো না।" তিনি স্বীকার না করুন, তাঁহার পবিত্র জীবন যে গীতার বাণীকে রূপ দিয়াছিল ইহা সত্য কথা।

১২৯৬ সালে কার্ত্তিক মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে গুরুদাস জননী সজ্ঞানে গীতা পাঠ শুনিতে শুনিতে একমাত্র পুত্র এবং বহু কলত্র রাখিয়া সত্যলোকে গমন করেন। তাঁহার পরম গতি লাভে স্যার গুরুদাসের সঙ্গে বহু লোক মাতৃহারা হয়। তিনি সকল সম্প্রদায়ের চক্ষে আদর্শ জননী ছিলেন। সেইজন্য শ্রাদ্ধের পর ব্রাহ্মসমাজের ভক্তমণ্ডলী স্যার গুরুদাসের বাটীতে একদিন সার্ব্বজনীন উপাসনা করিয়া এই রত্নগর্ভা নারীর স্মৃতি তর্পণ করেন।

তিনি লেখাপড়া জানিতেন না কিন্তু যাহা জানিতেন তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে নারী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। তিনি মায়ের মত মা ছিলেন—কেবল স্যার গুরুদাসের নয়, সমগ্র ভারতের। কবির ভাষায় তিনি "নিখিল-নম্যা জননী।"



শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্তমণ্ডলীর

জীবনী-সংগ্রহ

প্রথম ভাগ।

যে সকল মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্ত; মুনিঋষিদিগের তপস্যাসম্ভূত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আত্মসুখ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, বদ্ধজীবের বন্ধন ক্লেশ দূর করিবার জন্য তাঁহারা যে উপদেশ সকল, জগৎবাসীকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল ক্ষণজন্মা সাধকদিগের জীবনী, জীবনের অলৌকিক ঘটনা, এবং তাঁহাদের অমৃত তুল্য উপদেশ সকল, **জীবনী-সংগ্রহে** অতি সুন্দররূপে লিখিত আছে।

জীবনী-সংগ্রহে, বুদ্ধদেব—শঙ্করাচার্য্য—চৈতন্যদেব—ত্রৈলিঙ্গস্বামী—নারায়ণ স্বামী—রামদাস স্বামী—ভাস্করানন্দ সরস্বতী—দয়ানন্দ সরস্বতী সাধু তুকারাম—মহাত্মা কবির দাস—সাধক তুলসীদাস—গুরু নানক সাধু হরিদাস—যবন হরিদাস—সাধক রামপ্রসাদ—রামকৃষ্ণ পরমহংস বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—বিবেকানন্দস্বামী—আউলচাঁদ—রঘুনাথ দাস দীপঙ্কর—উদ্ধারণ ঠাকুর—বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী—মৌনী বাবা—পওহারী বাবা—শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী—বারদীর ব্রহ্মচারী—সাধক কমলাকান্ত প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জন্ম বৃত্তান্ত, জীবনের অলৌকিক ঘটনা সকল অতি সুন্দররূপে লিখিত আছে। ইহাতে আরও ঐ সকল মহাপুরুষদিগের ১৬ খানি হাফ্‌টোন ফটো আছে। পুস্তকখানি সোণার জলে সুন্দর বাঁধান মূল্য ২৲ টাকা।